লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

আমরা পর্যায়ক্রমে লোকশিক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছি। শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না। যত সহজে যত দ্রুত এবং যত ব্যাপক ভাবে এই ভার লাঘব করা যায় সেজন্য তৎপর হওয়া কর্তব্য। গল্প এবং কবিতা বাংলা-ভাষাকে অবলম্বন করে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক।

বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান-চর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব, জ্ঞানের সেই পরিবেষনকার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। এই কারণে আমাদের গ্রন্থগুলিতে ভাষার আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারা যাবে বলে আশা করি নে কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা উপন্যাস

শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

আষাঢ়, ১৩৫৪

মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
রংমশাল প্রেস লিঃ, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের পূর্ব সূচনা—প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে বাস্তবতার প্রসার

ইউরোপে উপন্যাসের জন্ম হইয়াছে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে, যখন সমাজে শ্রেণীর দাসত্বমুক্ত মানবের স্বাধীন মর্যাদা সবেমাত্র স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রেণীর একজন মানুষকে জানিলে যে সকলকেই জানা হইল, মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয়ই যে তাহার সম্বন্ধে পরম সত্য এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের ফল হইতেছে উপন্যাসে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক পরিচয়। সামাজিক প্রতিবেশ, শিক্ষা-দীক্ষা ও অবস্থার সাম্য সত্ত্বেও অন্তরের দুর্গম দুর্গে মানুষ যে সকল হইতে পৃথক, একাকীত্বের রহস্যে দুর্ভেদ্য—এই উপলব্ধির উপরেই উপন্যাস-সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানবের যে অন্তর-বৈচিত্র্য স্ফুটতর হইতেছে, উপন্যাস তাহারই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেছে। কাজেই যে আধুনিকত্বের প্রতিবেশে উপন্যাসের উদ্ভব, সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় ইহার মধ্যে সেই আধুনিক সুরটি সর্বাপেক্ষা প্রকট। আধুনিক মনের বিশেষভাবে উপযোগী বলিয়াই ইহার জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব মুখ্যতঃ ইংরেজি উপন্যাসের প্রভাবে। এই প্রভাব যেমন বাংলা কাব্য, নাটক, গীতিকবিতা

ও গদ্য-সাহিত্যের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল, তেমনি উপন্যাসের উপরেও। তফাৎ এই যে উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন আবির্ভাব। কাব্য-নাটকের ক্ষেত্রে হইয়াছে দেহ ও মনের পরিবর্তন, উপন্যাসের ক্ষেত্রে অভিনব সৃষ্টি। কিন্তু বাংলা উপন্যাস কেবল ইংরেজি উপন্যাসের সাহিত্যিক অনুকরণ নহে। এই বিভাগের পথিকৃতেরা যে বিশেষ কোনো বৈদেশিক আদর্শ সামনে রাখিয়া এই নূতন রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। প্রথম বাংলা উপন্যাস 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩) কোনো পাশ্চাত্য-গ্রন্থের নিকট প্রত্যক্ষভাবে ঋণী নয়। ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতি দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত বাঙালী-সমাজে যে বিক্ষোভ ও আলোড়ন জাগাইয়াছিল, ইহা তাহা হইতে স্বতঃ উদ্ভূত, তাহারই একটা অনিবার্য সাহিত্যিক প্রকাশ। সমাজ-জীবনের ভূমিকম্প, পারিবারিক ব্যবস্থার তীব্র বিপর্যয় মনকে নাড়া দিয়া, চিরসুপ্ত বাস্তব পর্যবেক্ষণশক্তিকে তীক্ষ্ণভাবে জাগ্রত করিয়া এই নূতন ধরণের চিত্রাঙ্কন-সাহিত্যকে প্রবর্তিত করিল। এতদিন পারিপার্শ্বিকের জড় নিশ্চল গতানুগতিকতা চক্ষুকে অর্ধনিমীলিত ও মনকে অসাড় রাখিয়াছিল; এখন ইহার উন্মাদ গতিবেগ ও দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্যপট, দর্শনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া, দৃষ্টি ও মননশক্তিকে পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় করিয়া তুলিল। কাজেই পাশ্চাত্য প্রভাব ঠিক প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসকে জন্ম দেয় নাই—অনুকূল প্রতিবেশ, অভিনব মানস ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করিয়া উপন্যাস প্রবর্তনের পরোক্ষ প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

কিন্তু রাম জন্মিবার পূর্বে রামায়ণ রচনার মত, এখানে এবং ইংলণ্ডে উভয়ত্রই, উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ বিবর্তনের বহু পূর্বেই ইহার অসম্পূর্ণ আভাস, বিচ্ছিন্ন অণুপরমাণু সাহিত্যিক আকাশ-বাতাসে ছড়ানো ছিল। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আশ্চর্য হইবার বিশেষ কিছু নাই। উপন্যাসের মৌলিক রূপ হইতেছে গল্প, যাহা অতি প্রাচীন যুগ হইতেই সর্বদেশের সাহিত্যেই প্রচলিত। যেখানেই লৌকিক গল্প-গাথা বা সাহিত্যিক আখ্যায়িকার মধ্যে বাস্তব মনোবৃত্তি প্রকট, সমাজের বা লোকচরিত্রের বাস্তব ছবি আঁকার চেষ্টা পরিস্ফুট, সেখানেই উপন্যাসের উপাদানের অস্তিত্ব। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে রামায়ণ-মহাভারত প্রমুখ মহাকাব্য, হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্র প্রমুখ সংস্কৃত আখ্যায়িকা, বৌদ্ধজাতক, মধ্য-যুগের মঙ্গলকাব্য ও রূপকথা—সমস্তই উপন্যাসের আকর। অবশ্য এই সমস্ত ক্ষেত্রে—এক বৌদ্ধজাতক ছাড়া—অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতেরই প্রাধান্য; বাস্তব চিত্রণ গৌণ উদ্দেশ্য ও ইহার আবির্ভাবও আকস্মিক। তথাপি অপ্রত্যাশিত আবেষ্টনে বাস্তবের ক্ষীণ ও অস্পষ্ট প্রতিচ্ছায়াই ইহাদিগকে উপন্যাসের সমগোত্রীয় করিয়াছে।

রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ-সাহিত্যে অতিপ্রাকৃতের অতিরঞ্জন প্রবণতা ও দেবদেবীর ও দেবানুগৃহীত বীরপুরুষদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের আড়ালে যে একটা বাস্তব সমাজচিত্র আত্মগোপন করিয়া আছে, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যসমালোচক এক মত। পুরাণ মহাকাব্যের অনেক দৃশ্য যে উপন্যাসের পাতায় স্থানান্তরিত

হইলে অশোভন বা বিসদৃশ দেখায় না, তাহা সহজেই বোঝা যায়। চরিত্র-অঙ্কনেও অনেক স্থলে আদর্শবাদের প্রভাব অতিক্রম করিয়া বাস্তবতার তীক্ষ্ণ বৈশিষ্ট্য জয়ী হইয়াছে। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম প্রভৃতি চরিত্রে প্রায় অবিমিশ্র আদর্শবাদই প্রতিফলিত; কিন্তু ভীম, দুর্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি দোষগুণে মেশানো মানুষগুলি উপন্যাসের চরিত্রের ন্যায়ই জীবন্ত ও বাস্তব-গুণসমৃদ্ধ। 'হিতোপদেশ' 'পঞ্চতন্ত্রে' নীতিশিক্ষার অত্যুৎসাহ বাস্তবতাকে অভিভূত করিয়াছে। আমরা উহাদের আড়ম্বরপূর্ণ উপদেশের পিছনে কোনো সুস্পষ্ট বাস্তবজীবনের ছবি পাই না, পাই একটা জটিল ব্যবহারিক জগতের ইঙ্গিত, যেখানে পদে পদে ঠকিবার সম্ভাবনা আমাদের সকল সময় সতর্ক হইবার শিক্ষা দেয় যেখানে কুটিল সংশয়নীতি জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার একমাত্র উপায়।

সংস্কৃত গল্প-আখ্যায়িকার সহিত তুলনায় বৌদ্ধ জাতক-সাহিত্যের মধ্যে ঔপন্যাসিক গুণের বিকাশ অনেক বেশি। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক। অভিজাত ও রাজন্যবর্গ অপেক্ষা মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর উপরই ইহার প্রভাব বেশি। কাজেই জাতক-সাহিত্যে আমরা বাস্তবসমাজ-প্রতিবেশের যে তথ্যবহুল সরস চিত্র পাই, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। প্রথমত, জাতকগুলিতে ভিক্ষুদের ধর্মজীবনে উচ্চ ও নীচ প্রবৃত্তির, সংযম ও প্রলোভনের মধ্যে সংঘর্ষের খুব বাস্তব বর্ণনা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সংস্কৃত পুরাণে সমস্ত মুনিঋষিই—কোপন-স্বভাব দুর্বাসা, ঝগড়া-বিবাদের

প্ররোচক নারদ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিশ্বামিত্র ছাড়া—এক ছাঁচে ঢালা; তাঁহাদের শিষ্যবর্গের মধ্যেও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সাধারণ আদর্শ অনুসরণের প্রভাবে অস্ফুরিত। বৌদ্ধসাহিত্যে আশ্রমেও জীবনের বৈচিত্র্য ও কলকোলাহল ছড়াইয়া পড়িয়াছে—ভিক্ষুর গৈরিক বসনের নিচে মানবহৃদয় আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায়, পাপ-পুণ্যের সংঘাতে দোলায়মান। দ্বিতীয়ত, গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তবরসপূর্ণ বর্ণনা আমাদিগকে তৎকালীন সাধারণ জীবনযাত্রার সহিত সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে পরিচিত করে। গল্পগুলি মামুলি ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে—জীবনের অফুরন্ত ও বহুমুখী বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তৃতীয়ত, পশুপক্ষী-বিষয়ক গল্পের মধ্যেও পরিহাসরস, বাস্তব-বর্ণনা ও প্রাণী-জগতের প্রকৃত স্বভাব ও ব্যবহার ফুটাইবার সার্থক চেষ্টা দেখা যায়। সংস্কৃত আখ্যায়িকায় গৃধ্র-জরদ্গব ও কঙ্কণদানেচ্ছু ব্যাঘ্র পূর্ণমাত্রায় নীতির বাহন হইয়া পড়িয়াছে—তাহাদের মধ্যে নিজ জাতিত্বসূচক কোনো লক্ষণের সম্পূর্ণ অভাব। চতুর্থত, এই বাস্তব-প্রধান মনোভাব বুদ্ধের চরিত্রাঙ্কনেও পরিস্ফুট। অবশ্য দেবমাহাত্ম্য-কীর্তনে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না—তথাপি জাতকে বুদ্ধের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত-বর্ণনে এক আশ্চর্য রকমের বাস্তবানুরক্তির পরিচয় মিলে। বোধিসত্ত্বকে সময় সময় নীচকুলোদ্ভব ও হেয়-বৃত্ত্যনুসারী রূপে দেখানো হইয়াছে—এমন কি এক জাতকে তিনি চোরের সর্দার রূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। সকল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে আদর্শ-চরিত্র অতিমানব রূপে আঁকিবার যে সাধারণ প্রবৃত্তি দেখা যায়, একমাত্র বৌদ্ধজাতকেই তাহার

অদ্ভুত সাহসিকতাপূর্ণ ব্যতিক্রম। এই সমস্ত দিক দিয়াই জাতকের, উপন্যাসের পূর্ব্বাভাসরূপে বিবেচিত হইবার, বিশেষ দাবি।

মধ্যযুগে আসিয়া আমরা প্রথম বাংলাভাষায় লিখিত কাব্য ও ধর্মসাহিত্যের মারফৎ আখ্যায়িকা-বিবৃতির চেষ্টার পরিচয় পাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অসংখ্য ধর্ম ও মনসামঙ্গল কাব্য—এইগুলির ভিতর দিয়া বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট রূপ ও আকার লাভ করিল। ইহাদের মধ্যে সংস্কৃত কাব্যাদর্শ ও পৌরাণিক বর্ণনারীতি ও ঘটনা-সন্নিবেশের ভিতর দিয়া সমসাময়িক সমাজের বাস্তব-বর্ণনা লক্ষ্য হয়। মূল রামায়ণ-মহাভারতের সহিত কৃত্তিবাস ও কাশীরামের অনুবাদগ্রন্থদ্বয়ের তুলনা করিলে বোঝা যাইবে যে অনুবাদের ভিতর দিয়া বাংলা সাহিত্য বাস্তবতার পথে অগ্রসর হইতেছে। ভাষান্তরের মধ্য দিয়া জাতি ও কালের উপযোগী গভীর ভাবগত পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে। মূল মহাকাব্যের ঘটনাগুলি বাঙালীর কোমল হৃদয়াবেগে অভিষিক্ত হইয়া, বাঙালীর দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনাদর্শের দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া, চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত কারুণ্য-রসের অশ্রুপ্লাবনে ভাসিয়া-ডুবিয়া অভিনব রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কৌরব ও পাণ্ডবদের জীবন-কাহিনী, রণপ্রতিবেশের নির্মম কাঠিন্য ও সুদূর অতীতের দুর্ভেদ্য অপরিচয় হারাইয়া, ভাবার্দ্র, স্নেহ-কোমল, সুপরিচিত বাঙালী পারিবারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ভক্তির একাধিপত্য বাস্তবপর্যবেক্ষণ ও হাস্যরসের বিরোধী শক্তির দ্বারা প্রতিহত

হইয়াছে। মুকুন্দরামের বাস্তব-প্রবণতা কৃত্তিবাস, কাশীরামদাসের সহিত তুলনায় অনেক বেশি—তাঁহার গ্রন্থে দেবমহিমা-কীর্তন অপেক্ষা মানুষের জীবন-বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। চণ্ডীর স্তবস্তুতি তাঁহার নিকট প্রাচীন প্রথার অনুবর্তন—কালকেতু ও ভাঁড়ুদত্তের উদার সারল্য ও উপহাস্য শঠতার ছবি আঁকা তাঁহার প্রতিভার মৌলিক প্রেরণা। দেবতা সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই, মানুষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিবার আছে। দেবতা সম্বন্ধে পুরাতনের আবৃত্তি, মানুষ সম্বন্ধে নবজাগ্রত তীক্ষ্ণ কৌতূহল—ইহাই হইল মুকুন্দরামের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ধর্ম ও মনসামঙ্গল কাব্যেও মুকুন্দরাম-প্রবর্তিত ধারাই অনুসৃত হইয়াছে। মুকুন্দরামের চরিত্রসৃষ্টি-নৈপুণ্য ও বাস্তবের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ইহাদের নাই —তথাপি এই সমস্ত গ্রন্থে বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশের পল্লী-জীবনের খণ্ড-দৃশ্য নদী, বিল, জঙ্গল, গ্রাম, গঞ্জ প্রভৃতির উল্লেখে একটা অস্পষ্ট ভৌগোলিক সংস্থানের প্রতিচ্ছায়া আমাদের নিকট মূর্ত হইয়া উঠে।

২

রূপকথা ও আনুমানিক অষ্টাদশ শতকে রচিত 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' উপন্যাসের আকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। রূপকথার মধ্যে যে গল্পাংশ বিবৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক অলৌকিক ও অসম্ভব ঘটনা থাকিলেও, মোটের উপর ইহা আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। পুণ্যের জয় ও পাপের

পরাজয়—এই সরল নীতিকথা ইহাদের মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু তথাপি আখ্যানবস্তু নৈতিকতার দ্বারা অযথা প্রভাবিত হয় নাই। গল্প বলিবার ভঙ্গীটি এমন সাবলীল, গহন অরণ্য, রাজসভার ঐশ্বর্য প্রভৃতি প্রতিবেশ বর্ণনায় ভাষাপ্রয়োগ এমন সরল, ওজস্বী, তীক্ষ্ণাগ্র ও চিত্রধর্মী, মানবচরিত্রের দুর্জ্ঞেয় পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে গল্পকার এমন সচেতন যে ইহাদের ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য উভয়ই যথেষ্ট। 'ময়মনসিংহগীতিকা' একাধারে সরস ও উপভোগ্য বাস্তব-বর্ণনায় সমৃদ্ধ ও রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। এই সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ আখ্যায়িকা-গুলি হইতে আমাদের সামাজিক প্রতিবেশের কিরূপ সংস্থান হইতে রূপকথার উদ্ভব তাহার পরিষ্কার ধারণা জন্মে। যেখানে খামখেয়ালী অত্যাচারের মাত্রা অধিক, সেইখানেই দৈবানুকূল্যের উপর নির্ভরও সেই পরিমাণে। এই দৈবানুকূল্য অপ্রত্যাশিত উদ্ধারের বেশে বাস্তব-জীবনেও আসে, আবার কল্পনার কল্পলোক হইতে, পশুপক্ষীর সহযোগিতা, যোগী-ব্রহ্মচারীর অনুগ্রহ ও স্বপ্নলব্ধ ভবিষ্যৎ-জ্ঞান প্রভৃতির মধ্যবর্তিতাতেও আহরিত হয়। সুখ-দুঃখের চক্রবৎ পরিক্রমণ, অতর্কিত ভাগ্যপরিবর্তনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই, ধর্মবিশ্বাস-প্রণোদিত, অতিপ্রাকৃতে স্বভাবতঃ আস্থাশীল কল্পনার দ্বারা রূপকথার অবাস্তব, মায়াময় সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য়, বস্তু-বৃন্ত ও কল্পনার ফুল—রূপকথার এই উভয় স্তরের উপরেই আলোকপাত হইয়াছে। এ ছাড়া, এই আখ্যায়িকাগুলিতে অন্য প্রকারের বাস্তব উপাদানের প্রাচুর্য বর্তমান। বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনায় সংস্কৃত-কাব্য-নির্দিষ্ট প্রথা অতিক্রম করিয়া

পাহাড়-পর্বত, বিল-খাল, বন-জঙ্গলের দুর্ভেদ্য জটিলতাও উচ্ছৃঙ্খল, অনিয়মিত অতিপ্রাচুর্যের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। নায়িকাদের চরিত্র-চিত্রণেও যে তেজস্বী আত্মসম্মানবোধ ও ভবিষ্যৎ চিন্তাহীন, মত্ত ভাবাবেগের নিদর্শন মিলে, তাহা ঠিক আর্য আদর্শের অন্ধ অনুবর্তন নহে। চাঁদবিনোদের ন্যায় দুর্বলচিত্ত প্রেমিক, ভাটুক ঠাকুরের ন্যায় লোভী, ধর্মজ্ঞানহীন, উৎপীড়ক আত্মীয়, নেতাই কুটনী, চিকণ গোয়ালিনী প্রমুখ অসচ্চরিত্রা, প্রলোভনের ফাঁদ পাতিতে সিদ্ধহস্ত স্ত্রীলোক—আমাদের বাস্তব সমাজের চিরন্তন, প্রতিকারহীন বিকৃতির নিদর্শন। 'ময়মনসিংহ গীতিকা' মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান ঘুচাইয়া আমাদের সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়াছে।

চৈতন্যদেবের চরিতগ্রন্থসমূহেও ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের সামাজিক জীবনের নির্ভরযোগ্য বিবরণ মিলে। তাঁহার নিজের জীবনের ঘটনাগুলি অনেক সময় চরিতকারদের উচ্ছ্বসিত ভক্তি ও তাঁহার দেবত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসের জন্য অলৌকিকত্বের রং মাখানো হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর তৎকালীন সমাজের রীতি-নীতি, চাল-চলন, রুচি-আদর্শ, সাধারণ লোকের দৈনিক জীবনযাত্রা, তীর্থপর্যটন, ধর্মবিষয়ক বিচার-বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়ের যে বিবরণ এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করা যায়, তাহা বাস্তবের সত্য প্রতিচ্ছবি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কেবল যে আমাদের ধর্মজীবনের নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়াছে তাহা নহে, আমাদের ঐতিহাসিক বোধকেও নবজীবনের প্রেরণা দিয়াছে। তাঁহার জীবনের সহিত সম্পর্কিত তুচ্ছতম ঘটনাও মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সযত্নে লিপিবদ্ধ হইয়া

বিস্মৃতি হইতে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার ভাবসমৃদ্ধ জীবন সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহের প্রবল আগ্রহ অসংখ্য ভক্তকে মহাকাব্য, কড়চা, জীবনচরিত, নাটক, ধর্মব্যাখ্যা প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থরচনায় প্রণোদিত করিয়াছে—সাহিত্যের মরা খাতে একটা কূলপ্লাবী জোয়ার আনিয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থে যে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার খাঁটি আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে তাহা নহে—ভক্তিপ্লাবনে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সন্দেহ-প্রবণ সতর্কতা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। তথাপি এই ধর্মোন্মাদনার প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যে একটা ঐতিহাসিক মনোভাব ও দৃষ্টি-ভঙ্গী, প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট সংবাদ-সংগ্রহ ও যথাশক্তি তাহার সত্যতা যাচাই করিয়া ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিপিবদ্ধ করিবার আগ্রহপূর্ণ প্রবণতা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী ভক্ত ও অনুচরবর্গ নবদ্বীপ হইতে পুরী ও বৃন্দাবনে অবিরত গমনাগমনের দ্বারা যে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই পথে ধ্যানমগ্ন ভক্তি বিহ্বলতা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি তথ্যানুসন্ধিৎসা হাত ধরিয়া পাশাপাশি যাত্রা করিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস যত সর্বব্যাপী হইয়া পড়িল, ততই এই তথ্যানুরক্তি, অলৌকিকত্ব আবিষ্কারে উন্মুখ কল্পনা ও আপন আপন গোষ্ঠী-গুরুর মাহাত্ম্যপ্রচারাকাঙ্ক্ষী অন্ধ ভক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া, অতিরঞ্জনস্ফীত কিম্বদন্তীর পর্যায়ে অবনমিত হইল। কাজেই চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে ইহা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

৩

বাংলা সাহিত্যের আখ্যায়িকার ভাণ্ডারে মুসলমানী গল্পেরও

অসদ্ভাব ছিল না। এই সাহিত্যচর্চায় মুসলমানেরও একটা অপ্রধান অংশ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি আলাওল কবিতার ভিতর দিয়া জনপ্রিয় আরবী ও পারসী উপন্যাস সমূহ বাঙালী পাঠকের গোচর করিয়াছেন। তা ছাড়া, প্রত্যেক কাব্যের ভূমিকাতে কাব্য-রচনার উপলক্ষ্য-বিবৃতির অবসরে কবি আমাদিগকে সমসাময়িক যুগের আরাকান রাজ্য ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন অংশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত কিন্তু উজ্জ্বল ছবি দিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কাব্যের উপক্রমণিকাগুলি যেন কল্পনা-বিলাসের মহাসমুদ্রের মধ্যে বাস্তববোধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ। গ্রন্থের মধ্যে অলৌকিকতার যতই উদ্দাম আতিশয্য থাকুক, গ্রন্থারম্ভে কবি যে নাতিবিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা কিন্তু আশ্চর্যরূপে বাস্তব-ধর্মী। ইহা ব্যতীত, লোকমুখে প্রচলিত গল্প-কেচ্ছার মধ্যে হাতেমতাই, লায়লা-মজনু, চাহার-দরবেশ, গোলেব-কাওলি ও আরব্য উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত বিচ্ছিন্ন আখ্যায়িকাসমূহ হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শ্রোতৃ-বর্গের মনোরঞ্জন করিত। এগুলির মধ্যে মুসলমান প্রতিবেশ ও চিন্তাধারার ছাপ থাকিলেও ইহারা সকলেই রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। কতকগুলির ব্যক্তি ও স্থানের মুসলমানী নাম, জীন ও পরীর অজ্ঞাত ইন্দ্রজাল-শক্তি, পারিবারিক ব্যবস্থার কয়েকটি অপরিচিত আইন কানুন ও আদবকায়দা বাদ দিলে, ইহারা হিন্দু শ্রোতার সম্মুখেও সেই চিরপরিচিত রূপকথার সুরটিই ফুটাইয়া তুলিত। উপন্যাসের উপর এই জাতীয় গল্পের যে বিশেষ প্রভাব ছিল তাহা বলা যায় না। তবে ইহার প্রতিবেশের নূতনত্বের কিছু আকর্ষণ নিশ্চয়ই ছিল। এই

সমস্ত আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া মুসলমান সমাজ ও রাজসভা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই বোধ হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হিন্দু-মুসলমানের বিরোধমূলক ছদ্ম-ঐতিহাসিক (pseudo-historical) উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে। পরবর্তী উপন্যাসে দিল্লী-আগ্রার রাজসভার মণি-মাণিক্য-দীপ্ত ঐশ্বর্য ও মুসলমান রাজা-বাদশার খামখেয়ালী অস্থিরমতিত্ব বর্ণনায়, ঐতিহাসিক সত্য ও এই কাল্পনিক আখ্যায়িকা-জগতের প্রেরণা কি পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা সহজ নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপন্যাসের উদ্ভব ও তৎকালীন বঙ্গসমাজের পটভূমিকা

অষ্টাদশ শতকের শেষ হইতে ইংরেজি শিক্ষা-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাঙালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বাঙালীর পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগের বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মিত স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত স্ফূরণকে সুসংবদ্ধ, কেন্দ্রসংহত রূপ দিল। কিন্তু তাহারও পূর্বে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙালী সমাজে একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন চলিতেছিল। রামমোহন রায়ই সর্ব-প্রথম ইংরেজের সহিত সম্পর্ককে ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক ভিত্তি হইতে বুদ্ধি ও মননশক্তিগত ভিত্তিতে উন্নয়ন করিয়া এক বিপ্লবকারী পরিবর্তনের সূচনা করিলেন। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে বাঙালী কেবল ইংরেজের বাণিজ্য বা সাম্রাজ্যবিস্তারের বাহনমাত্র নহে—ইংরেজের শিক্ষা-সংস্কৃতিরও উত্তরাধিকারী। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ তিনিই সর্ব প্রথম আমাদের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচনায় প্রয়োগ করিয়া বাঙালীর সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও আচারকে একদিকে খৃষ্টান মিশনারিদের অযথা আক্রমণ ও অপরদিকে গোঁড়া রক্ষণশীল দলের অন্ধ ও মূঢ় বাৎসল্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে মনোভাব অব-লম্বন করিলেন, যে স্বাধীন চিন্তা, সুদৃঢ় যুক্তিবাদ ও তীক্ষ্ণ বাস্তবতা-

বোধের প্রয়োগ করিলেন, তাহাতেই বঙ্গদেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ চিরকালের জন্য নিরূপিত হইল।

এই বাদ-প্রতিবাদের কোলাহল-মুখর, উত্তেজিত প্রতিবেশে উপন্যাসের জন্ম হইল। দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া অনুসৃত ধর্মানুষ্ঠান ও আচার-ব্যবহার যখন আক্রমণের বিষয়ীভূত হয়, তখন আলোচনার ধারা যুক্তি-তর্কের মন্থর প্রণালী ছাড়াইয়া হৃদয়াবেগের বেগবান প্রবাহের সহিত সংযুক্ত হয়—তথ্যবিচার সাহিত্য-পদবীতে উন্নীত হয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষের মার্জিত দীপ্তি ও শাণিত তীক্ষ্ণতা, এই মানস উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ যুক্তিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যালোক-স্পৃষ্ট বর্শাফলকের মত ঝলকিত হয়। এই শ্লেষপ্রধান মনোভাব ক্রমশঃ আশু প্রয়োজনের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া নিরপেক্ষভাবে সমস্ত সমাজ-জীবনের উপর বিস্তৃত হয়। সমাজ-জীবনের ব্যাধি-বিকার, আতিশয্য-অসংগতির প্রতি মন সহসা সচেতন হইয়া উঠে, এই নব জাগ্রত দেবতার জন্য বলি খুঁজিয়া বেড়ায়। সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার শ্লেষাত্মক পর্যবেক্ষণ ও ইহার হাস্যোদ্দীপক, বিসদৃশ দিকগুলির ব্যঙ্গচিত্র-অঙ্কন, উপন্যাস-রচনার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর।

২

এই সময়ে সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা (১৮১৮) কিছুদিন ধরিয়া মনোমধ্যে সঞ্চিত শ্লেষপ্রবণতাকে অভিব্যক্তির ক্ষেত্র ও প্রেরণা যোগাইল। সংবাদপত্রের সহিত উপন্যাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত হইয়াছে। খবরের কাগজের সম্পাদক পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য, দেশের মধ্যে

যাহা কিছু বিচিত্র, কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিতেছে তাহা সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে সচেষ্ট থাকেন। নানা রকমের উড়ো পাখি, আজগুবি খবর, অপ্রত্যাশিত ও চমকপ্রদ ঘটনা, যাহা মনকে নাড়া দেয় ও হাস্য-কৌতুকের সৃষ্টি করে,—এই সাংবাদিক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় বাসা বাঁধে। নানাবিধ সামাজিক সমস্যার লঘু সরস আলোচনা, নানা বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষ, প্রতিপক্ষের কুৎসারটনা ও তাহার দুর্নীতির নানা মুখরোচক উদাহরণ ইহাকে বাস্তব-জীবনের সত্য ও উপভোগ্য প্রতিচ্ছবির মর্য্যাদা দেয়। সংবাদপত্রের দর্পণে সমাজ নিজ বহিরবয়ব ও মনোবাসনার নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়।

বাস্তব-জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া, ঘটনার ধারাবাহিকতা ও শিল্পী মনের সচেতন উদ্দেশ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, এক সম্পূর্ণ, অন্তঃ-সংগতিবিশিষ্ট কাল্পনিক চিত্রে সংহত হয়। ইহাই সজ্ঞান উপন্যাস-সৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর। শ্রেণীবিশেষের জীবনের বিচ্ছিন্ন অধ্যায়গুলি কিরূপে কাল্পনিক চরিত্রের সমগ্রতায় পরিণত হইল তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত পাই ১৮২১ সালে—'সমাচার-দর্পণে' 'বাবু'চরিত্র আলোচনায়। সম্পাদক তাঁহার কাগজের দুইটি সংখ্যায়—২৪ শে ফেব্রুয়ারি ও ৯ই জুন, ১৮২১—বড়লোকের আদুরে গোপাল শিক্ষা-চরিত্রহীন ছেলের জীবনযাত্রা ও মতিগতির একটি সংক্ষিপ্ত, ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিয়াছেন। এই তিলকচন্দ্র উপন্যাস-জগতের প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত 'বাবু'-বংশের আদিপুরুষ। ইনি মোসাহেব-মণ্ডলে পরিবেষ্টিত ও আত্মাভিমানপুষ্ট হইয়া, বাহ্য আড়ম্বরে অন্তরের অন্তঃসারশূন্যতা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া নানা হাস্যকর অসংগতির সৃষ্টি

করিয়াছেন ও লেখকের বিদ্রূপবাণ বিদ্ধ হইয়া পাঠকের শিক্ষা-বিধান ও মনোরঞ্জনের দ্বৈত উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হইয়াছেন। এই আদি 'বাবু'র চরিত্রে দুঃশীলতা ও ব্যসন-বিলাস অপেক্ষা মোসাহেব-মহলে প্রতিপত্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টার প্রতি বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে।

৩

ইহার দুই বৎসর পরে ১৮২৩ সালে প্রকাশিত, প্রমথনাথ শর্মা-রচিত 'নববাবুবিলাস' প্রথম উপন্যাসের গৌরব দাবী করে। প্রমথনাথ শর্মা 'সমাচার চন্দ্রিকা', ও 'সংবাদ-কৌমুদী' পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক ও নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজের মুখপাত্র ধর্মসভার কার্যাধ্যক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। সম্ভবতঃ ইনিই 'সমাচার দর্পণে, প্রকাশিত তিলকচন্দ্রের জীবন-কাহিনীর সংকলয়িতা। এই অনুমান সত্য হইলে 'নববাবুবিলাস' 'সমাচার-দর্পণের' 'বাবু'-কাহিনীর পরিবর্ধিত সংস্করণ—প্রথম মৌলিক পরিকল্পনার অপেক্ষাকৃত পল্লবিত বিস্তার। ইহাতে 'বাবু'-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচার, খেয়ালী অস্থিরমতিত্ব, সৌজন্য ও সুরুচির অভাব, বাল্যকালে হিতকর শাসন-সংযমের উল্লঙ্ঘন ও পরিণামে দুর্গতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু লেখকের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র-স্ফুরণ নহে, সমস্ত সমাজ-প্রতিবেশের চিত্রাঙ্কন। 'বাবু' অপেক্ষা যে সমাজে বাবুর উদ্ভব তাহার প্রতি তাঁহার মনোযোগ বেশি।

এই সময়ের কলিকাতা-সমাজে যে বিলাস ও ব্যভিচারের স্রোত বহিয়া গিয়াছে তাহার সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার

যে খুব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল তাহা মনে হয় না। যে 'বাবু' এই সমাজের বিশিষ্ট সৃষ্টি, তিনি ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ ধার ধারেন না। 'নববাবুবিলাসের' ৩৫ বৎসর পরে রচিত 'আলালের ঘরে দুলালে'র (১৮৫৭) নায়ক মতিলাল শেরবোর্ন সাহেবের স্কুলে কিছুদিন যাতায়াত করিয়াছিল, কিন্তু কয়েকটি ইংরেজি শব্দ ও কিছু ইংরেজি হাবভাব ও চালচলন শিক্ষা ব্যতীত তাহার বিদ্যা অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। কাজেই ইহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ঠিক দায়ী করা যায় না। এই দিক দিয়া ইহাদের সহিত পরবর্তী যুগের হিন্দু কলেজে শিক্ষিত, ইংরেজি আচার-ব্যবহারের সত্যকার অনুরাগী, সমাজবিদ্রোহী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত, নিজ মতবাদের জন্য দুঃখবরণে প্রস্তুত দৃঢ়চেতা যুবক সম্প্রদায়ের প্রভেদ। মতিলাল ও মাইকেল মধুসূদনের মুখে হয়ত একই রকমের বুলি, তাহাদের বিলাতি খানাপিনা ও সুরার দিকে সাধারণ প্রবণতা—কিন্তু মানস আদর্শের দিক দিয়া ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়।

আসল কথা, বাবু-সমাজের অমিতাচারের জন্য দায়ী ইংরেজি শিক্ষা বা নৈতিক আদর্শ নহে, ইংরেজি বাণিজ্যের প্রসার। এই যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের সহিত প্রথম সম্পর্ক-স্থাপনের ফলে দেশে অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধির একটা ক্ষণস্থায়ী জোয়ার আসিয়াছিল। বাঙালী বেনিয়ান এদেশের ইংরেজের পণ্যদ্রব্য প্রচলিত করিয়া ও ইংরেজের বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য কাঁচামাল যোগাইয়া তাহাদের বিপুল লাভের কিছু কিছু অংশ পাইতেছিল। এই অপ্রত্যাশিত ধনাগমের অহংকারে

স্ফীত হইয়া এই বৈদেশিক-প্রসাদ-পুষ্ট ব্যক্তিগুলি এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায় গঠন করিতেছিল। কেহ দালালি করিয়া, কেহ নিমক-মহলের ইজারা লইয়া, কেহ বা ইংরেজের রাজস্বসংগ্রহ-ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ইংরেজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী যে স্বর্ণপদ্মের উপর আসীনা হইয়াছিলেন তাহার দুই-একটা পাপড়ি নিজ ধনভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছিলেন। এই সময় কলিকাতার বনিয়াদি পরিবারবর্গের অভ্যুদয়ের প্রথম ভিত্তি স্থাপন হইল। মহানগরী সমুদ্রগর্ভোত্থিতা ঐশ্বর্য দেবীর ন্যায় আকাশস্পর্শী অট্টালিকাশ্রেণীতে নিজ সৌভাগ্য-দীপ্তি প্রতিফলিত করিয়া জন্মলাভ করিল। সমস্ত শহরের আকাশ-বাতাসে একটা আনন্দ ও উত্তেজনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। উচ্ছ্বসিত প্রাণস্রোত—আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ব্যসন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রহসনের নব নব উদ্ভাবনে, চড়কের গাজনে, বারোয়ারি উৎসবে, কবির লড়াইয়ে, সুরা-সংগীতের উন্মত্ত ভোগলিপ্সায়—বিজয়-অভিযানে নির্গত হইল। অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লীসমষ্টি রাজধানীতে রূপান্তরিত হইয়া রূপের উজ্জ্বলতায়, লক্ষ লক্ষ নবাগত জনসংঘের সম্মিলিত হৃৎ-স্পন্দনে, বিরাট ঐক্যের সচেতনতায় যেন নবযৌবনের দৃপ্ত শক্তিমত্তায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই আশা ও সীমাহীন সম্ভাবনার পুলকোৎফুল্ল প্রতিবেশে 'বাবু'র উদ্ভব। সে যেন জীবনোৎসবের এই ফেনিল মত্ত বিক্ষোভের প্রথম স্বল্পায়ু, রঙিন বুদ্বুদ। আর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই উদ্দাম, অসংস্কৃত জীবন-প্রবাহের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উগ্র উন্মাদনা, বিদ্রোহী নীতিবোধ ও নিগূঢ় সৌন্দর্যানুভূতি যুক্ত হইয়া এক উচ্চতর সৃষ্টির বীজ বপন করিবে। বাবুর স্থূল ইতর ভোগবিলাস

কবি ও সমাজ-সংস্কারকের সুক্ষ্মতর জীবনরসোপভোগে পরিবর্তিত হইবে। 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২)—এই তিনখানি উপন্যাসে বাবু-চরিত্র ও বাবু-প্রসূতি সমাজ-জীবন আলোচিত হইয়াছে। 'নববাবুবিলাসের' কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ঠিক উপন্যাস নহে—নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত আমোদ-উৎসবের বিচ্ছিন্ন খণ্ড চিত্রের সরস ও ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার শিথিলগ্রথিত সমষ্টি। ঐশ্বর্যের নূতন জোয়ারে নাগরিক জীবনযাত্রায় যে সমস্ত উদ্ভট অসঙ্গতি ও রুচি-বিকারের দৃষ্টান্ত, স্ফূর্তি-ইয়ারকির নূতন নূতন প্রকরণ, উপভোগের যে মত্ত আতিশয্য ভাসিয়া আসিয়াছে, লেখক তাহাদের উপর তীব্র শ্লেষপূর্ণ কষাঘাত করিয়া নিজ পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ও ভাঁড়ামির পর্যায়ভুক্ত অমার্জিত রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিশৃঙ্খল, প্রাণবেগ-চঞ্চল দৃশ্যগুলির মধ্যে কোনো ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত চরিত্র সৃষ্ট হয় নাই—সুতরাং উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ চরিত্র-চিত্রণেরই ইহাতে অভাব।

৪

এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল'ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমধিক উপন্যাসের লক্ষণ-বিশিষ্ট। এই শ্রেষ্ঠত্ব বাস্তব-বর্ণনা, চরিত্র-চিত্রণ ও মননশীলতা—সমস্ত দিকেই পরিস্ফুট। ইহাতে যে বাস্তব প্রতিবেশের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'নববাবুবিলাস' ও 'হুতোমের' সঙ্গে তুলনায় গভীরতর স্তরের। প্রথমোক্ত দুইটি গ্রন্থে

কেবল হাল্‌কা ফূর্তির উপযোগী পটভূমিকা—গাজনতলা, কবির আসর, রাস্তার জনপ্রবাহ ও বেশ্যালয়—বর্ণিত হইয়াছে। 'আলালের' প্রতিবেশ আরও পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল, জীবনের নানামুখীনতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহাতে কেবল রাস্তাঘাটের কর্ম্মব্যস্ততা ও সজীব চাঞ্চল্য নাই, আছে পারিবারিক জীবনের শান্ত ও দৃঢ়মূল কেন্দ্রিকতা, আইন-আদালতের কৌতূহলপূর্ণ কার্যপ্রণালী, নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনের যে সুকল্পিত বহির্ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ব্যক্তিজীবনের গতিচ্ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আনিতেছে তাহার সম্পূর্ণ চিত্র। চরিত্রাঙ্কনে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব আরও সুপ্রকট। মানুষ যে ঘটনাপ্রবাহে ভাসমান খড়কুটা মাত্র নয়, তাহার ব্যক্তিত্ব যে নদীতরঙ্গপ্রহত পর্বতের ন্যায় কম্পিত হইলেও স্থানভ্রষ্ট হয় না—ইহাতে চরিত্রচিত্রণের এই আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে। বাবুরাম বাবু নিজে, তাঁহার গৃহিণী ও কন্যাদ্বয়, মতিলাল ও তাহার দুষ্ক্রিয়ার সহযোগিবৃন্দ—ইহারা সকলেই ঘটনাতরঙ্গে গা ভাসাইলেও এই তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত জলকণা মাত্র নহে—ইহারা জীবন্ত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, 'বাবু'র ন্যায় চর্মের ক্ষীণ আবরণে ঢাকা শ্রেণীর প্রতিনিধি মাত্র নহে। তা ছাড়া, লেখকের পরিকল্পনার এমন একটা সাবলীল সজীবতা আছে, যাহাতে ঘটনার সহিত পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলি আরও অধিক পরিমাণে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঠক চাচা উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত সৃষ্টি; কূটকৌশল ও স্তোক-বাক্যে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতা উহার মধ্যে এমন চমৎকারভাবে সমন্বিত হইয়াছে যে পরবর্তী উন্নত শ্রেণীর উপন্যাসেও ঠিক এইরূপ সজীব চরিত্র মিলে না। বেচারাম, বেণী, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছা-

রাম প্রভৃতি চরিত্রও—কেহ বা অনুনাসিক উচ্চারণে, কেহ বা সঙ্গীত-প্রিয়তায়, কেহ বা কোনো বিশেষ বাক্যভঙ্গীর পুনরাবৃত্তিতে—স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছে। এই বাহ্য বৈশিষ্টের উপর ঝোঁক ও ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন প্রবণতায় (caricature) প্যারীচাঁদ অনেকটা ডিকেন্সের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। বরং রামলাল ও বরদাবাবু চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়া ম্লান ও বিশেষত্ববর্জিত—কতকগুলি সদ্‌গুণের যান্ত্রিক সমষ্টি মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন। কৃত্রিম সাহিত্যরীতি বর্জনে ও কথ্যভাষার সরস ও তীক্ষ্ণাগ্র প্রয়োগে 'আলালের' বর্ণনা ও চরিত্রাঙ্কন আরও বাস্তবরসসমৃদ্ধ হইয়াছে।

এই গ্রন্থের মননশীলতার পরিচয় পাই ইংরেজি সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ, অপক্ষপাত মনোভাবে, ইহার কুফলের প্রতি অন্ধ না হইয়া ইহার সুফলের সম্বন্ধে সচেতনতায়, লেখকের সমন্বয়কারী, চিন্তা-শীল দৃষ্টিভঙ্গীতে। রামলাল ও বরদাবাবু এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির শ্লাঘ্যতম ফল—তাহাদের উদার ক্ষমাশীলতা, পরদুঃখকাতরতা ও উন্নত নৈতিক আদর্শ, সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির বিরোধী না হইলেও, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার দ্বারা নূতন ভাবে উদ্‌বুদ্ধ। মতিলালের দুঃশীলতা ঠিক ইংরেজি শিক্ষাপ্রসূত না হইলেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে যে সামাজিক শিথিলতা ও উন্মার্গগামী হইবার প্রচুরতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। গ্রন্থ মধ্যে তত্ত্বা-লোচনার প্রাচুর্য—যদিও ইহা অনেক স্থলে অপ্রাসঙ্গিক ও ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের পরিপন্থী,—লেখকের চিন্তাশীলতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দেয়। 'নববাবু বিলাস' হইতে ৩৫ বৎসরের ব্যবধানে 'আলালের

ঘরের দুলালে' প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব উপন্যাসের বিবর্তন বহুদিনের প্রত্যাশিত সম্ভাবনাকে সার্থক রূপ দিয়াছে। উপন্যাস হিসাবে ইহা খুব উচ্চশ্রেণীর নহে—অন্তরের ঘাতপ্রতিঘাত ও গভীর আলোড়ন ইহাতে নাই। মতিলালের অনুশোচনা ও সংশোধন বহির্ঘটনার চাপে, অন্তরের প্রেরণায় নহে। তথাপি 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস-সাহিত্যের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া প্রথম অনিশ্চয়তাত্মক যুগের অবসান ও আসন্ন পূর্ণ পরিণতির সূচনা ঘোষণা করে। ইহার মাত্র ৮ বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) হইতে উপন্যাসের মহিমান্বিত, প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল যৌবনের আরম্ভ।

তৃতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের উদ্ভব

১৮৬২ সালে প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' কালহিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু ঔপন্যাসিক আদর্শ ও সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এই যুগে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রবর্তন ও সামাজিক উপন্যাসের উচ্চতর আর্টের পদবীতে উন্নয়ন। ১৩৪৯ সনের বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কনক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বাংলা ভাষায় ইতিহাস-ঘটিত কাহিনীর প্রথম দৃষ্টান্ত এবং ইহার রচয়িতা, বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ্রুতকীর্তি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রথম প্রবর্তনের কৃতিত্ব লাভের অধিকারী। এই গ্রন্থের মধ্যে 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এই দুইটি আখ্যায়িকা অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রথমটি অতি ক্ষুদ্রায়তন—ইহাতে সম্রাট আলক্তগীনের কন্যা জেহিরার সহিত তাঁহার ক্রীতদাস ও মন্ত্রী সুবক্তগীনের প্রণয়সঞ্চারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আখ্যায়িকা শিবাজীর সহিত আওরঙ্গজেবের দুহিতা রোসিনারার প্রণয়বিষয়ক—ইহাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশেষ মর্যাদা ও কলাকৌশল সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার ইতিহাসঘটিত অংশ ও অন্তররহস্য-বিশ্লেষণ—এই উভয়েরই আলোচনায় উচ্চাঙ্গের কৃতিত্বের

নিদর্শন মিলে। রোসিনারার শিবাজীর প্রতি প্রেম, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব, ও প্রণয়াস্পদের কল্যাণকামনায় মিলনাকাঙ্ক্ষার বিসর্জন সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব ও শিবাজীর চরিত্র ইতিহাসানুযায়ী হইয়াছে—দিল্লী ও মহারাষ্ট্রের ঐশ্বর্য-সমারোহ, ও যুদ্ধব্যবস্থাও নিপুণ-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ ও আলোচনা-বৈশিষ্ট্য উভয় দিক্ দিয়াই ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রথম পথপ্রদর্শক।

কিন্তু তথাপি ইহার রূপের স্থিরীকরণ ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠার সহিত বঙ্কিম-চন্দ্রের নামই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তিনিই পর পর কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়া ইহার আকার-নির্দেশ, ইতিহাস-ক্ষেত্র হইতে বিষয়-নির্বাচনের ও ইহাকে রসসমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার বিশেষ কৌশল, ইতিহাসের বৃহৎ সংঘটনের সহিত পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্রসীমাবদ্ধ সুখদুঃখের ঘনিষ্ঠসম্পর্কস্থাপন, অতীত যুগের সাধারণ রূপ ও বীরত্বপূর্ণ বিকাশগুলিকে ফুটাইয়া তোলার নিপুণতা প্রভৃতি উৎকর্ষ-লক্ষণগুলি চিরন্তনভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে মৌলিক নহেন—ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্কট তাঁহার পূর্ববর্তী ও পথপ্রদর্শক। তথাপি স্কটের মূলসূত্রগুলি তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত ভারত ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির পটভূমিকায় প্রয়োগ করিয়াছেন, ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞতার অভাব কল্পনাসমৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করিয়াছেন, তাহা উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ঐতিহাসিক উপন্যাস যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে,

তাহা মোটামুটি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হইতে পারে। (১) ইহার সংঘটন-কাল কোনো অতীত যুগ—নিকট কিম্বা দূর, যাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কতকটা পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত, স্মৃতি-কল্পনায় মেশা, অস্পষ্ট। (২) কোনো বৃহৎ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা ইহার পটভূমিকা—তাহারই ছায়াতলে ইহার বর্ণিতব্য দৃশ্যগুলি অভিনীত হইবে। (৩) ঐতিহাসিক আন্দোলনের সহিত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের সংমিশ্রণই ইহার প্রধান উপাদান। ইতিহাসের বেগবান তরঙ্গ কেমন করিয়া ব্যক্তির জীবনে তীব্র বিক্ষোভ ও বিপর্যয় আনে, ক্ষুদ্র পারিবারিক সমস্যা ইতিহাস-সংস্পর্শে কেমন করিয়া বিস্তৃতি ও জটিলতা লাভ করে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে আমরা মুখ্যতঃ তাহারই ছবি পাই। (৪) আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া বর্ণিত যুগের বিশেষ সত্তা, তাহার নাড়ীর বিশেষ স্পন্দন, তাহার আদর্শ, চিন্তাধারা ও কর্ম্মপ্রণালীর রূপ-বৈশিষ্ট্যটি আমাদের নিকট দর্পণে প্রতিফলিতবৎ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। (৫) এই শ্রেণীর উপন্যাসে সাধারণতঃ বীরত্বপূর্ণ, উচ্চআদর্শ-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রাই বর্ণিত হয়—উচ্ছ্বসিত, আত্মোৎসর্গকারী দেশানুরাগ, দুর্দ্ধর্ষ, অনমনীয় দৃঢ়সংকল্প, তীব্র জাতি- বা ধর্ম্ম-বিরোধ, মৃত্যুস্পর্ধী প্রেম, দুঃসাহসিক ক্ষাত্রধর্মের বিস্ময়কর স্ফুরণ প্রভৃতি এই জীবনের অসাধারণ গতিবেগ সূচিত করে। (৬) ইহাতে মোটের উপর চরিত্রাভিব্যক্তি অপেক্ষা ঘটনার রোমাঞ্চকর অসাধারণত্বই প্রবল হইয়া উঠে। ব্যক্তিত্ব ঘটনার চাপে সংকুচিত হইয়া ঘটনাপ্রবাহকেই অনুসরণ করে। (৭) এখানে আমরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর চরিত্রেরই সাক্ষাৎ পাই—মহিমান্বিত বা যথেচ্ছাচারী সম্রাট, রাজনীতিবিশারদ, কূটকৌশলী বা

ধূর্ত, বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী, দৃপ্ত ক্ষাত্রতেজের প্রতিমূর্তি তরুণ প্রেমপ্রবণ রাজপুত্র, রাজভক্ত বা রাজবিরোধী অভিজাত-সম্প্রদায়, উচ্চাভিলাষ-গর্বিতা দাম্ভিকা বা আদর্শপত্নী রাজমহিষী ও প্রেমস্বপ্নবিভোর, কোমল-হৃদয় রাজকন্যা। এই আড়ম্বরপূর্ণ রাজসভা ও উগ্রকোলাহলমুখর রণক্ষেত্রে ইতর জনসাধারণের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ পরিচয় মিলে না। চরিত্রাঙ্কনের গৌণত্ব, বাস্তব-চিত্রণে আকস্মিকতার প্রাদুর্ভাব ও স্থূল বর্ণবিন্যাস-প্রবণতা, ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান দুর্বলতা। আধুনিক যুগে বাস্তবতাবাদের যে উচ্চ আদর্শ ও সূক্ষ্ম, নিখুঁত কারুকার্যের মানদণ্ড প্রচলিত, তাহার পরিমাপে ইহার কাঁচা কাজের ত্রুটিগুলি আরও বেশি করিয়া চোখে পড়ে।

২

অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্রকে যে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে কার্য করিতে হইয়াছে, তাহাতে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের সমস্ত সর্তগুলি পূরণ করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ, যে ইহার সাহায্যে কোন অতীত যুগের জীবনযাত্রার পুনর্গঠন সম্ভব নহে। অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কেবল কয়েকজন রাজা, রাজকর্মচারী, সেনা-পতির চরিত্র ও কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সমস্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও বৃহৎ সংঘটনের অন্তরালে প্রজাসাধারণের প্রাত্যহিক জীবন, নবাগত তুর্কীবিজেতাদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞ। অর্ধাব-গুণ্ঠিত শতাব্দীগুলি সারি সারি এক নীরব-গম্ভীর শোভাযাত্রায় গ্রথিত

হইয়া আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন রাজা ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত সংস্রবই তাহাদের একমাত্র পরিচয়, নতুবা এক শতাব্দী হইতে আর একটিকে পৃথক করার অন্য কোনো উপায় নাই। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অতীতের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা সহজেই অনুভূত হয়। প্রতিবেশের গাঁথুনি অত্যন্ত শিথিল ও ইহার মধ্যেকার ফাঁকগুলি কল্পনার সাহায্যে পূর্ণ করা হইয়াছে। স্কটের উপন্যাসে আমরা যেমন সমসাময়িক-জীবনযাত্রার সহিত প্রত্যক্ষ গভীর পরিচয়ের নিদর্শন পাই, যুগ বৈশিষ্ট্যটি আমাদের কাছে যেমন সুস্পষ্ট হয়, বঙ্কিমচন্দ্রে প্রতিবেশের সেরূপ তথ্যবহুল, সাধারণ মানুষের অন্তরলোকের চিহ্নাঙ্কিত বর্ণনা মিলে না। মোটের উপর বলা যায় যে সুদূর অতীত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা অস্পষ্ট ও কল্পনাপ্রধান। আধুনিক যুগের তিনি যতই নিকটবর্তী হইয়াছেন, ততই পরিচয়ের প্রসার ও গভীরতা বাড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে 'মৃণালিনীতে' মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের যে বিবরণ আছে, তাহাতে এরূপ একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রতি সাধারণ লোকের মনোভাব মোটেই ফোটে নাই। কি আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় বঙ্গদেশ এত সহজে বৈদেশিক শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিল তাহার কোনো ব্যাখ্যা মিলে না। পক্ষান্তরে 'চন্দ্রশেখর' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে ইংরেজ আমলের প্রথম অবস্থা মোটামুটি পর্যাপ্ত তথ্যসন্নিবেশে অনেকটা সুস্পষ্ট হইয়াছে। তবে বঙ্কিমের প্রতিভা সময় সময় একরূপ অভ্রান্ত সংস্কারবশে অজ্ঞাত সুদূর অতীতের উপর ঐতিহাসিক কল্পনার বিদ্যুৎশিখা ফেলিয়া যুগের অন্ধকারকে মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত

করিয়াছে। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সহজসাধ্যতার পিছনে যে দেশদ্রোহিতার কল্পনা অনিবার্য, বঙ্কিম তাহাকে পশুপতি-চরিত্রে মূর্ত করিয়াছেন। প্রতাপের রুদ্ধগৃহদ্বারে জন্‌সন-গলস্টনের সদর্প পদাঘাত ভারতবিজয়ী ইংরেজের মদগর্বিত আত্মপ্রত্যয়ের খাঁটি অভিব্যক্তি। এইরূপে প্রতিভা কল্পনার নীলাকাশে পক্ষবিস্তারের দ্বারা তথ্যাভাবের মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, আর একটি কারণের উপর ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষের তারতম্য নির্ভর করে। ঐতিহাসিক প্রতিবেশের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধ কোথাও বা নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ, কোথাও বা ভাসাভাসা রকমের। ইতিহাস কোথাও বা গার্হস্থ্য জীবনের সহিত গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ, কোথাও বা সুদূর দিক্‌চক্রবালের মত ইহার উপর উদাসীনভাবে নত হইয়া ইহাকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়াছে। কাজেই ঐতিহাসিক পট-ভূমিকার বিন্যাস ও সাধারণ দৈনিক জীবনের সহিত ইহার সংযোগের স্বাভাবিকতাও ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসে আপেক্ষিক উৎকর্ষ-অপকর্ষের হেতু হয়। ইতিহাস ও গার্হস্থ্য জীবনের সম্পূর্ণ সমন্বয়ের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও অনেক পাশ্চাত্য সমালোচক সন্দিহান। তাঁহারা মনে করেন যে সোনার পাথরবাটির মত ঐতিহাসিক উপন্যাস অসম্ভব ও অবাস্তব—ইহা বিকৃত কাল্পনিক ইতিহাস ও পরতন্ত্র, অপরিণত উপন্যাসের একরূপ জগাখিচুড়ি। এই চরম মতবাদ স্বীকার না করিলেও ইহা ঠিক যে পরস্পরবিরোধী উপাদান ও দাবির সমন্বয়-সাধনে খুব নিপুণ কলাকৌশলের প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই বিপদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট

সচেতন ছিলেন। তিনি সেইজন্য তাঁহার রচিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে কেবল 'রাজসিংহ'কেই খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া দাবি করিয়াছেন। এইরূপ উক্তির তাৎপর্য বোধ হয় এই যে 'রাজসিংহে'ই বঙ্কিম অবিকৃত ইতিহাসকে প্রায় আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। তা ছাড়া, এখানে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিই উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী ও ইতিহাসের সংঘটনই উপন্যাস-বর্ণিত বিষয়ের প্রধান অংশ। জেবউন্নিসা ও দরিয়ার সহিত মবারকের মৃত্যু-গহন প্রেমসম্পর্কটিই লেখকের একমাত্র কল্পনাপ্রসূত সংযোজনা। এমন কি এই ব্যক্তি-গত সমস্যাও এখানে রাজনৈতিক জটিলতার দুশ্ছেদ্য পাকে জড়িত—রাজনৈতিক চক্রঘর্ষণে সঞ্জাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মানব-হৃদয়ে অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য এখানেও চরিত্র-পরিকল্পনায় ও যুদ্ধনীতি-বর্ণনায় বঙ্কিম বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক সত্যপরায়ণতার আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই উভয় দিকেই বঙ্কিমের পরিকল্পনাকে প্রমাদযুক্ত বলিয়া মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষসমর্থনে বলা যায় যে আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও তাঁহার রাজপুত যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে তিনি প্রচলিত মতবাদ-গুলির মধ্যে নিজ যুক্তি ও বিশ্বাস অনুযায়ী একটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অনিবার্য মতভেদের বিষয়গুলিতে চূড়ান্ত সত্যনির্ধারণ ঔপন্যাসিকের কথা দূরে থাকুক, ঐতিহাসিকের পক্ষেও অসম্ভব। মানুষের মনের অন্তরতম রহস্য "দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ"—কাজেই ঔপন্যাসিকের উপর আওরঙ্গজেব বা শিবাজীর মত জটিল-প্রকৃতি রাজার চূড়ান্ত রহস্যোদ্ভেদের দায়িত্ব অর্পণ করিলে উপন্যাস লেখা অচল,

এমন কি ইতিহাস লেখাও দুরূহ। ঔপন্যাসিক যে মত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যুক্তিসংগত ও স্ববিরোধশূন্য, সুপরিজ্ঞাত তথ্যের দ্বারা সমর্থিত হইলে, এবং বিদ্বেষ বা পক্ষপাতের দ্বারা স্বেচ্ছাবিকৃত না হইলে, তিনি দোষমুক্ত। এই আদর্শে বিচার করিলে বঙ্কিচন্দ্রের বিরুদ্ধে কর্তব্যচ্যুতির অভিযোগ আনা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহে' ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা-নির্দেশে যে কঠোর আদর্শের উল্লেখ করিয়াছেন, কার্যতঃ তাহার প্রয়োগে অনেকটা শৈথিল্য বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। উপন্যাসে ইতিহাস অপ্রধান ও কতকটা কল্পনা দ্বারা রূপান্তরিত হইলেও তাহার ঐতিহাসিক অভিধান স্বীকার্য। ইতিহাসের কঠিন বস্তুস্তূপকে গলাইয়া সেই দ্রবীভূত নির্যাসকে নিজ উদ্দেশ্য বা আদর্শের ছাঁচে ঢালিবার স্বাধীনতা ঔপন্যাসিকের আছে। ইতিহাসের মর্মগত সত্য বিকৃত না হইলে, অপ্রধান বহির্ঘটনার দুই একটিকে পরিবর্তন করিলে বা নিঃসম্পর্ক ঘটনাবলীর মধ্যে আর্টের খাতিরে যোগসূত্র রচনা করিলে চণ্ডী অশুদ্ধ হয় না। এই শিথিলতর আদর্শে বিচার করিলে, বঙ্কিমের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও, তাঁহার আরও কয়েকটি উপন্যাস ঐতিহাসিক-পদ-বাচ্য। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে মোগল-পাঠানে যুদ্ধ ও এই যুদ্ধের আবর্তে পড়িয়া ছোটখাট ভূম্যধিকারীদের পক্ষাবলম্বনে বিচার-বিভ্রম ঐতিহাসিক সত্য। আবার যুদ্ধের দ্রুত-পরিবর্তনশীল, উত্তেজনার বৈদ্যুতীভরা আকাশ-বাতাসে প্রেমের আকস্মিক উদ্ভবও মনস্তাত্ত্বিক

সত্য। সুতরাং তিলোত্তমা-আয়েষার প্রেম ও ইহাদের সংশয়-সন্দেহ-নৈরাশ্যের সুরগুলি ঐতিহাসিক প্রতিবেশের সহিত বেশ স্বাভাবিক সম্পর্কান্বিত। কতলু খাঁ, ওসমান ও জগৎসিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, যদিও শেষোক্ত নায়ক সুরাসক্ত বিলাসী হইতে আদর্শ ক্ষত্রবীরে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখানে ইতিহাস ও উপন্যাস দৃঢ় বন্ধনে গ্রথিত। কিন্তু 'মৃণালিনী'তে ইহাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত দুর্বল ও আলগা ধরণের। মৃণালিনী-হেমচন্দ্র ও পশুপতি-মনোরমার হৃদয়-বিক্ষোভের সহিত বঙ্গদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের বিশেষ কোনো সংযোগ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজ সূক্ষ্ম অনুভূতিবলে ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই, প্রথম সংস্করণের, হেমচন্দ্র কর্তৃক বখ্‌তিয়ার খিলিজির হস্তিপদ-দলন হইতে উদ্ধার-বিষয়ক অধ্যায়—যাহা গ্রন্থের ঐতিহাসিক মুখবন্ধ বিবেচিত হইতে পারে—পরবর্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। হেমচন্দ্র পাঠান-অভিযানের নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র; পশুপতির রাজনীতি ও তাহার প্রেম এক বৃন্তের ফুল নহে। ইতিহাসের এই উদাসীন স্তব্ধতা ভঙ্গের জন্যই মণিমালিনী-ব্যোমকেশ, গিরিজায়া-দিগ্বিজয় প্রভৃতি প্রাকৃতজনের মুখরতা এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা'তে ইতিহাসের বিশেষ কোনো সার্থকতা নাই—একমাত্র মতিবিবির কলুষিত পূর্বজীবনের সহিত তাহার ভোগবতী-ধারার ন্যায় অকস্মাৎ উদ্বেলিত পতি-প্রেমের বৈপরীত্য-সূচনার জন্য ইহার প্রবর্তন। কপালকুণ্ডলার জীবনে বিপদের যে কৃষ্ণমেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহার একটা নগণ্য অংশ মাত্র রাজনীতির ক্রূর বিদ্যুৎশিখায় ভ্রূকুটি-কুটিল। সুতরাং 'কপালকুণ্ডলা'কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।

'সীতারামে'র ঘটনার কাল সপ্তদশ শতকের শেষ বা অষ্টাদশের প্রথম। ধ্বংসোন্মুখ মোগল-সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া একজন অখ্যাত জমীদারের স্বাধীনতা-ঘোষণা ও স্বল্পদিনস্থায়ী রাজ্যপ্রতিষ্ঠা—ঘটনার দিক দিয়া সত্য, কিন্তু এতই অকিঞ্চিৎকর যে ইহাতে ইতিহাসের গুরুত্ব আরোপ করা চলে না। উপন্যাসের প্রধান বিষয় সীতারামের অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ, শ্রীর প্রতি অতৃপ্ত রূপমোহে তাহার মহনীয় চরিত্রের অধঃপতন ও চরম বিপদের মুহূর্তে তাহার নৈতিক মহিমার পুনরুদ্ধার। ইতিহাসের পটভূমিকায় তাহার গৌরব ও পতনের কাহিনী আরও মহিমান্বিত হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের সহিত সংস্রবশূন্য হইলেও তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা অক্ষুণ্ণ থাকিত। ঐতিহাসিক উপাদানের স্বল্পতার জন্যই 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা সঙ্গত নহে। 'চন্দ্রশেখর' পলাশীর যুদ্ধের অল্পদিন পরের ঘটনা বিবৃত করিয়াছে। এখানে ইতিহাস কেবল পশ্চাৎপট মাত্র নহে, আখ্যায়িকার মধ্যে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট। রাজনৈতিক বিপ্লব দরিদ্র ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর ও বাংলার নবাব মীরকাশেমের অদৃষ্টকে সমভাবে অভিভূত করিয়াছে, শৈবলিনী ও দলনীকে নিয়তির একই দুশ্ছেদ্য নাগ-পাশে জড়াইয়াছে। ইতিহাসের নিগূঢ় উদ্দেশ্যের বাহন ইংরেজ উভয়েরই দুর্গতির হেতু। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে দলনীর আত্মোৎসর্গ ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের গৌরবময় ব্যর্থ প্রচেষ্টা একই সুরে বাঁধা। 'চন্দ্রশেখরে' ইতিহাসের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের সন্তোষজনক সমন্বয় হইয়াছে বলিয়া ইহা মোটামুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের সর্ত পূরণ করে।

মীরকাশেমের রাজ্যচ্যুতির কয়েক বৎসরের মধ্যেই এবং অনেকটা ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তখন ইংরেজ প্রজাপালনের ভার লয় নাই, কর-সংগ্রাহক মাত্র। দুর্ভিক্ষ এই অরাজকতারই একটা অর্থনৈতিক-বিপর্যয়মূলক অভিব্যক্তি। কাজেই 'আনন্দমঠে' ইতিহাস প্রবেশ করিয়াছে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র, রাজা বা শাসনকর্তার মধ্যবর্তিতায় নহে, সমাজবিধ্বংসী, এমন কি মানবপ্রকৃতির উন্মূলনকারী দুর্ভিক্ষের প্রেতমূর্তিতে। গ্রন্থমধ্যে একটি অধ্যায়ে মাত্র এই দুর্ভিক্ষদানবের করাল দংষ্ট্রা-বিকাশের ছবি উদঘাটিত হইয়াছে। তারপর দস্যুহস্ত হইতে পলায়িত কল্যাণীর অনুসরণ করিয়া আমরা যে গভীর বনে প্রবেশ করিলাম তাহা সমসাময়িক ইতিহাসের গণ্ডী ছাড়াইয়া মহান্ দেশপ্রেমের কল্পনায় অনুরঞ্জিত এক অনাগত, সুদূর ভবিষ্যতের কল্পলোকে প্রয়াণ করিয়াছে। ইতিহাস এখানে আখ্যায়িকাকে নিজ দৃঢ়বদ্ধ কাঠামোর মধ্যে ধরিয়া রাখে নাই—ইহার বিঘূর্ণিত চক্র, ব্যাধনিক্ষিপ্ত বাঁটুলের ন্যায়, উপন্যাসকে বর্তমান বাস্তবতা হইতে অতি দূরে, এক গৌরবময়, অনায়ত্ত পরিকল্পনার ভাস্বর বাষ্পলোকে সবেগে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। ইতিহাস এখানে দাঁড়াইবার স্থান দেয় নাই, উড়িবার প্রেরণা দিয়াছে। যাহা ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে বাঁধে নাই, যাহা ঘটিতে পারে তাহার অসীম সম্ভাবনার মধ্যে মুক্তি দিয়াছে। অঙ্কুরের মধ্যে মহীরুহ-দর্শী দিব্যদৃষ্টি ইতিহাসকে মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করিয়া ইহা হইতে বিরাট, নক্ষত্রদীপ্ত ব্যোমপথে উধাও হইবার গতিবেগ আহরণ করিয়াছে।

'দেবীচৌধুরাণী' 'আনন্দমঠের' ঠিক পরবর্তী দশকের কাহিনী

ও ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে অনেকটা 'আনন্দমঠের' সমধর্মী। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর ইংরেজ এখন স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলাকে এখনও আয়ত্তে আনিতে পারে নাই। এখনও দস্যুবৃত্তির স্পর্ধিত, প্রায় প্রকাশ্য প্রাদুর্ভাব রাজশক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই বাস্তব, অর্ধ-অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে একটু আদর্শ-বাদের সুর মিশাইয়া বস্তুপ্রধান উপন্যাসকে রোমান্সের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। দস্যুদলপতি, আদর্শ শিক্ষক ও দেশের স্বাধীনতা-উদ্ধারে না হউক, সমাজ-জীবনের নির্বিঘ্নতারক্ষাকার্যে ব্রতী। দেবীচৌধুরাণী এই খেলাঘরের রাজ্যস্থাপনে নিষ্কামধর্মে দীক্ষিতা আদর্শ রানীর অভিনয় করিয়াছে। বঙ্কিমের আসল উদ্দেশ্য এখানে রাজনৈতিক নহে, ধর্মনৈতিক। দেবীকে সত্যকার রানী সাজাইবার তাঁহার তত আগ্রহ নাই; তাঁহার প্রকৃত আগ্রহ তাহাকে রাজসিংহাসন হইতে গার্হস্থ্যজীবনে স্থানান্তরিত করিয়া এই অনভ্যস্ত প্রতিবেশেও তাহার সহজ কৃতিত্ব প্রদর্শন। এই সাফল্যের জন্য প্রশংসা প্রাপ্য অবশ্য তাহার শিক্ষাপ্রণালীর। সুতরাং শেষ পর্যন্ত জয়ঘোষণা হইয়াছে নিষ্কামধর্মের। এই উপন্যাসে সামাজিক জীবন হইতে স্বতন্ত্র কোনো ইতিহাসের অস্তিত্ব নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদের সহিত আধুনিক কালের বঙ্গসমাজের কোনো মূলগত পার্থক্য নাই। কাজেই হরবল্লভ, ব্রজেশ্বর, নয়ানবৌ, সাগরবৌ, ব্রহ্মঠাকুরাণী আমাদের নিতান্ত ঘরোয়া জগতের অধিবাসী। ইহাদের সঙ্গে তুলনায় বিমলা-আসমানির, গিরিজায়া-দিগ্বিজয়ের, নন্দা-রমা-

শ্রী-জয়ন্তীর, এমন কি শৈবলিনী-সুন্দরীর ও দেবীচৌধুরাণীর দিবা-নিশার মধ্যে ভিন্ন দেশ না হউক ভিন্ন কালের কিছু স্পর্শ আছে। একমাত্র দেবীকে নীতিশিক্ষার ও রাজনৈতিক সংস্রবের উচ্চ মঞ্চে দাঁড় করাইয়া ঐতিহাসিক গৌরব অর্পণের কিছু চেষ্টা লক্ষিত হয়। কিন্তু সেও এই কৃত্রিম উচ্চাসন হইতে স্খলিত হইয়া শেষ পর্যন্ত সামাজিক জীবনের সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। আমাদের অতিপরিচিত বাস্তবজীবনে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা যে একটিমাত্র সুড়ঙ্গপথ রচনা করিয়াছে, বঙ্কিম বর্তমান উপন্যাসে অতি সুকৌশলে তাহারই সুযোগ লইয়া ঘরোয়া কাহিনীর মধ্যে আদর্শবাদ ও রোমান্সের অসাধারণত্বের সঞ্চার করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-সম্পর্কিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে কোন্‌গুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা যায় তাহার নির্ধারণের চেষ্টা করা গেল। মোটের উপর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', ও 'রাজসিংহকে' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব ও ইতিহাসজ্ঞানের স্বল্পতা বশতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাসে সাফল্যলাভ যে কিরূপ দুরূহ তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বঙ্কিম নিজ প্রতিভাবলে এক্ষেত্রে প্রায় অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন। সমসাময়িক অন্যান্য ঔপন্যাসিকের সহিত তাঁহার তুলনা করিলেই তাঁহার কলাকুশলতার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাইবে। বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থতালিকায় ১৮৭৫ হইতে ১৮৮২-৩ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত প্রকাশিত কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম উল্লিখিত আছে। তাহাদের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার হইতে তাহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি কত

দুর্বল, কল্পনাপ্রধান ও বাস্তবজীবনের সহিত সম্পর্করহিত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বিনোদবিহারী গোস্বামীর 'পূর্ণশশী' (১৮৭৫) কাশ্মীরের রাজপুত্রের সহিত উদাসিনী রাজকন্যার বিবাহের আখ্যান ; হারাণচন্দ্র রাহার 'রণচণ্ডী' (১৮৭৬) নবদ্বীপরাজ কর্তৃক কাছাড়-আক্রমণের বিবরণ ; কেদারনাথ চক্রবর্তীর 'চন্দ্রকেতু' (১৮৭৭) বক্তিয়ার খিলিজি কর্তৃক বঙ্গবিজয় ও লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যচ্যুতির পর গোরাচাঁদ নামক একজন ছদ্মবেশী মুসলমান ফকির কর্তৃক প্রদেশের কিয়ৎ অংশের পুনরুদ্ধারের কথা ; রাখালদাস গাঙ্গুলির 'পাষাণময়ী' (১৮৭৯) আলিবর্দীর রাজত্বকালে বঙ্গে বর্গী-আক্রমণের সহিত সংপৃক্ত প্রেম-কাহিনী ; আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'রাজকুমারী' (১৮৮০) বিক্রমপুরের হিন্দুরাজার সহিত ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরবাসী অনার্য রাজার যুদ্ধের বিবরণ ; হেমচন্দ্র বসুর 'মিলন-কানন' (১৮৮২) সম্রাট জাহাঙ্গীরের একটি প্রেমাভিনয়ের বর্ণনা ; তারকনাথ বিশ্বাসের 'সুহাসিনী' (১৮৮২) পারিবারিক জীবনে প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার হস্তক্ষেপের উপাখ্যান। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ব্যর্থ প্রয়াসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।

৪

উপন্যাসের এই বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর যিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিমের ন্যায় তাঁহার কল্পনার ঐশ্বর্য ছিল না, কিন্তু অধিকতর সত্যনিষ্ঠা ছিল। তিনি ইতিহাসকে কল্পনার সাহায্যে নিজ আদর্শ অনুযায়ী রূপান্তরিত করেন নাই, খাঁটি ঐতিহাসিক সত্যকে যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে

অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা'তে (১৮৭৩) ইতিহাস অস্পষ্ট ও প্রাণহীন। দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবী-কঙ্কণে' (১৮৭৬) তিনি মোগল-সভা ও রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্যপূর্ণ সমারোহ, কুটিল চক্রান্তজাল ও স্বেচ্ছাচারিতার যে চিত্র দিয়াছেন তাহার কাব্যোৎকর্ষ ও ঐতিহাসিক সত্যানুবর্তন উভয়ই প্রশংসার্হ। এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যে দুইটি প্রেমচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা প্রতিবেশের সহিত সংগতিবিশিষ্ট ও জ্বালাময় আবেগে উত্তপ্ত। এই প্রথম দুইটি উপন্যাসে কল্পনা ও ঐতিহাসিক-তার সংমিশ্রণে মোটের উপর বঙ্কিম-অবলম্বিত প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্রের 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা' রাজসিংহের আদর্শে রচিত খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজপুতের শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও মহারাষ্ট্রের নবীন উৎসাহদীপ্ত উত্থান—ভারত-ইতিহাসের এই দুই গৌরবোজ্জল অধ্যায় ইহাদের বিষয়বস্তু। এই দুইটি যুগের জাতীয় জীবনে যে উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশপ্রেম, যে মহিমান্বিত আত্মোৎসর্গ প্রবৃত্তি, আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করিবার যে দৃঢ়, অনমনীয় সংকল্প স্ফুরিত হইয়াছিল, রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তাহা অগ্নিস্রাবের ন্যায় জ্বালাময়ী ভাষায় ও বর্ণনাভঙ্গীতে উদ্গীরিত হইয়াছে। ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক যুগের ন্যায় ভারত-ইতিহাসের এই দুইটি যুগ সমগ্রভাবে বীরত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সুতরাং এই দুইটি উপন্যাসে যুদ্ধবিগ্রহের রোমাঞ্চকর উন্মাদনা, রাজপুতবীরের অসাধারণ স্বাধীনতা-প্রিয়তা, রাজপুতরমণীর ভয়ংকর আত্মাহুতি—সমস্তই যুগের সত্য

অতিরঞ্জনহীন প্রতিকৃতি, লেখকের কল্পনা-উচ্ছ্বাস নহে। যেখানে সমগ্র জাতীয় জীবন এইরূপ রণোন্মাদগ্রস্ত, সেখানে পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, শান্ত ভাবধারার যথোচিত বিকাশ সম্ভব নহে; সর্বগ্রাসী যুদ্ধপ্রচেষ্টা ইহাদিগকে কুক্ষিগত বা অত্যন্ত সংকুচিত করে। কাজেই 'জীবনসন্ধ্যায়' তেজসিংহ-পুষ্পকুমারী ও 'জীবনপ্রভাতে' রঘুনাথ-সরযূবালার প্রেম এই যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ, নিরবসর আবহাওয়ায় শুষ্ক, শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত প্রেমকাহিনীতে ভীলবালার ঈর্ষা ও বালিকাসুলভ দুষ্টামি কতকটা বৈচিত্র্য আনিয়াছে। ইহা ছাড়া, 'জীবনসন্ধ্যায়' রাঠোর চন্দাবতের পুরুষপরম্পরাপ্রসারিত, অনির্বাণ জাতিবিরোধ ও 'জীবনপ্রভাতে' রঘুনাথের প্রতি চন্দ্ররাও-এর ক্ষমাহীন জিঘাংসা বৃহত্তর জাতীয় সংঘর্ষের মধ্যে একটা সংকীর্ণতর পারিবারিক বিরোধের প্রবর্তন করিয়া যুগের সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রটি পূর্ণতর করিয়াছে। সমগ্র দেশব্যাপী বহ্নিবেষ্টনের মধ্যে এই ছোট ছোট অগ্নিশিখাগুলি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বীর-মনোভাবের উপর উজ্জ্বল আলোক ফেলিয়াছে।

যদিও ঐতিহাসিক উপন্যাসে চরিত্রস্ফুরণ বহির্ঘটনানিয়ন্ত্রিত হইয়া অনেকটা প্রতিহত ও অগভীর হয়, তথাপি শিবাজী ও আরংজীবের চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ইহার কারণ যে উভয়েই ঠিক সনাতন আদর্শানুযায়ী রাজা নহেন—উভয়েরই চরিত্রে একটা তীক্ষ্ণ, অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য আছে। শিবাজীর মধ্যে জলন্ত স্বদেশপ্রেমের সহিত 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' এই চাণক্য-নীতির অসংকোচ প্রয়োগ তাঁহার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের হেতু।

আরংজীবের মধ্যে তীব্র উচ্চাভিলাষ ও প্রবল ধর্মোন্মাদনা বাহিরের সৌজন্য ও বৈরাগ্যাভিনয়ের আড়ালে সংবৃত হইয়াছে। শিবাজী ও আরংজীব কেহই নৈতিকতার দিক হইতে অনিন্দনীয় নহেন—বোধ হয় বাধাবিঘ্নসংকুল, বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে রাম বা হারুণ-অল-রসীদের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণযোগ্য নহে। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অনেকটা স্বজাত্যভিমানের প্রেরণায় ইঁহাদের কলঙ্ক-ক্ষালনের চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু ঔপন্যাসিকের দিক হইতে এই কলঙ্কই ইহাদের একটা বিশিষ্ট আকর্ষণ। ইতিহাসের লজ্জা উপন্যাসের গৌরব।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের পর ঐতিহাসিক উপন্যাসের অগ্রগতি প্রায় প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের পরবর্তীরা প্রায় কেহই তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই। ইতিহাসের শুষ্ক পঞ্জরে প্রাণ সংযোগ করিতে হইলে যেরূপ জীবন্ত কল্পনার প্রয়োজন তাহা ইঁহাদের অনধিগম্য। আধুনিক যুগে যে সমস্ত নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে অতীত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের প্রসার কিছু বৃদ্ধি হইলেও, কোনো যুগের সামাজিক জীবনের ব্যাপক ধারণা জন্মে না বা কোনো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির মানবিকতা নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে না। কাজেই এই খণ্ডিত ও অসংবদ্ধ তথ্যসমষ্টি এ পর্যন্ত কোনো ঔপন্যাসিক কল্পনাকে উত্তেজিত করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের ঐতিহাসিক উপন্যাসদ্বয়ে—'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'তে—ইতিহাসের সক্রিয়তা ও বৈচিত্র্যের সম্পূর্ণ অভাব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক' 'ধর্মপাল' প্রভৃতি উপন্যাস ইতিহাসজ্ঞান ও কল্পনা-

দৈন্যের তুল্যভাবে পরিচয় দেয়। এই সমস্ত ব্যর্থ দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, ইতিহাসের নবাবিষ্কৃত খণ্ড-রাজ্যাংশগুলি এখনও পর্যন্ত কল্পনা-প্রবাহে উর্বরতা প্রাপ্ত হইয়া নূতন জীবলোকসৃষ্টির উপযোগী হয় নাই। সামাজিক উপন্যাসে লব্ধপ্রতিষ্ঠা শ্রীযুক্ত অনুরূপা দেবী 'রামগড়' ও 'ত্রিবেণী' (১৯২৮) উপন্যাসদ্বয়ে বৌদ্ধযুগের ও বঙ্গে পালযুগের সামাজিক জীবনযাত্রা ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা কতক পরিমাণে আমাদের কৌতূহলপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে—বহু-প্রাচীন শতাব্দীর প্রাণস্পন্দন, প্রতিবেশ-রচনা ও চরিত্রসৃষ্টির অস্পষ্টতার মধ্য দিয়াও, কতকটা অনুভূত হয়। বঙ্গসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইতিহাস ইহার গৌরবময় প্রারম্ভের প্রত্যাশা রক্ষা করে নাই—ইহার স্বল্পায়ুজীবনের উপর পরিসমাপ্তির যবনিকা অতি দ্রুত ও আকস্মিক-ভাবেই নামিয়া আসিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮—১৮৯৪) হাতে বাংলা উপন্যাস অতি দ্রুত-গতিতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি ও রূপ স্থির করা সম্বন্ধে তাঁহার কৃতিত্বের কথা পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। সামাজিক উপন্যাসেও তিনি অচিন্তিতপূর্ব অর্থগৌরব ও পরিণত সৌন্দর্যসুষমা প্রবর্তন করিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের ছোটখাট দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কি গভীর রহস্যলীলার অভিনয় হইতে পারে, কি বিরাট উত্তুঙ্গ মহিমা মাথা তুলিয়া উঠে, কি স্নিগ্ধ কারুণ্যরসের নির্ঝর বহিয়া যায়, বঙ্কিমের প্রত্যেকটি উপন্যাস তাহা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। একদিকে তিনি জীবনের অপরিমেয়, অতল-স্পর্শ গভীরতা, ইহার চিরন্তন বিস্ময় ও প্রহেলিকা, নিয়তির দুর্জ্ঞেয়, ক্রূর উৎপীড়নের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; অন্যদিকে জীবনে অমোঘ নীতি-বিধানের প্রভাব, কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের অনিবার্য উদ্ভব, ক্ষুদ্র অসংযমের সহিত ভয়াবহ পরিণতির অবিচ্ছিন্ন গ্রন্থন—এক কথায় জীবনের অলঙ্ঘ্য, অথচ দুরবগাহ নিয়মাধীনতার দিকটাও তাঁহার উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে চরিত্রসৃষ্টি খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই। ঐতিহসিক চরিত্রগুলির মধ্যে মানসিংহ ও কতলু খাঁ

বিশেষ জীবন্ত নহেন। জগৎসিংহ ও ওসমান আরও পূর্ণভাবে চিত্রিত; তবে জগৎসিংহ আদর্শ ক্ষত্রবীর ও প্রেমিক; তাঁহার ব্যক্তিত্ব সেরূপ পরিস্ফুট হয় নাই। ওসমানের মহানুভবতার মধ্যে ঈর্ষ্যা ও অদম্য বৈরনির্যাতনস্পৃহার অতর্কিত বিকাশ তাঁহাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে। বীরেন্দ্রসিংহের চরিত্রে অসীম অহংকার ও আত্মবিশ্বাস বেশ ফুটিয়াছে। স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে বিমলা, আয়েষা ও তিলোত্তমার রূপ ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লেখক সার্থক ব্যঞ্জনাপূর্ণ বর্ণনা ও ব্যবস্থার উভয়বিধ উপায়েই বিশদ করিয়াছেন। বিমলার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও রসিকতা, সময় সময় অমার্জিত হইলেও, তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সত্য পরিচয়। বৈধব্যের পর তাহার বিষাদম্লান গাম্ভীর্য, তাহার লঘু হাস্যপরিহাসের ধারণা মন হইতে মুছিয়া দিয়া তাহার চরিত্রমহিমা প্রতিষ্ঠিত করে। কতলু খাঁর হত্যা তাহার অসামান্য সাহস ও দৃঢ়সংকল্পের নিদর্শন।

ঘটনাবিন্যাসে নবীন লেখক অসামান্য কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিমলা-বিদ্যাদিগ্‌গজের ছেলেমানুষি রঙ্গ-তামাশার মধ্যে এক অজ্ঞাত, আসন্ন বিপদের শঙ্কা ছায়াপাত করিয়াছে। দুর্গ-জয়ের বিবরণে, বীরেন্দ্রসিংহের বিচারদৃশ্যে ও কতলু খাঁর হত্যাবর্ণনায় লেখকের আবেগ-ব্যঞ্জনায় ভাস্বর বর্ণনাশক্তির চমৎকার অভিব্যক্তি হইয়াছে। কারাগারে জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার প্রেমনিবেদন অনেকটা অতিনাটকীয় (melodramatic); রোমান্সসুলভ চমকপ্রদ অতর্কিততার উদাহরণ। তিলোত্তমার স্বপ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের অতিপ্রাকৃতের প্রতি প্রবণতা ও ইহার নিগূঢ় সাংকেতিকতা ফুটাইয়া তোলার শক্তি —উভয়েরই প্রমাণ।

এই প্রথম, অপরিপক্ক রচনায় কয়েকটি ত্রুটিবিচ্যুতিও সহজেই চোখে পড়ে। বিমলা ও বীরেন্দ্র সিংহের সম্বন্ধটি অযথা রহস্যাবৃত করা হইয়াছে। বিমলার দীর্ঘ আত্মপরিচয়পত্রও উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থানকে অনাবশ্যকরূপে জটিল করিয়া তোলে। দিগ্‌গজের ব্যাপারটা স্থানে স্থানে উপভোগ্য রসিকতায় সরস হইলেও অধিকাংশ স্থানেই প্রহসনের ধার ঘেঁসিয়া গিয়াছে। তবে উপন্যাসে সে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নহে—তাহারই মুখ দিয়া জগৎসিংহ বিমলা-তিলোত্তমার নবাব-অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ার সংবাদ পাইয়াছেন। অভিরাম স্বামী বঙ্কিমের সন্ন্যাসীজাতীয় অলৌকিক ক্ষমতাশালী চরিত্র প্রবর্তন প্রবণতার প্রথম উদাহরণ।

'কপালকুণ্ডলা'তে, (১৮৬৬) বঙ্কিম-প্রতিভার পূর্ণ দীপ্তি প্রোজ্জ্বল। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে অনিশ্চয় ও অনুকরণ প্রবণতার চিহ্ন লক্ষিত হয় এখানে তাহা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। 'কপালকুণ্ডলা'র প্রধান উৎকর্ষ ইহার পরিকল্পনার মৌলিকতা ও ত্রুটিহীন প্রয়োগ। আমাদের দেশে জীবনে রোমান্স সংক্রামিত হয়, যুদ্ধবিগ্রহ বা প্রেমের উত্তেজনার মধ্যবর্তিতায় নহে, প্রবল, সর্বগ্রাসী ধর্মানুভূতির ভিতর দিয়া। কপালকুণ্ডলার চরিত্রের যে অসাধারণত্ব তাহার মূল তাহার নিঃসঙ্গ প্রতিবেশ ও তাহার অস্থিমজ্জায় সংক্রামিত তান্ত্রিক ধর্মসাধনার প্রভাব। সমুদ্রতীরের বিরাট, সুগম্ভীর নির্জনতা ও কাপালিকের ভয়াবহ তন্ত্রোপাসনা-পদ্ধতি তাহার চরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্য ও কমনীয়তার সহিত এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে সমাজজীবন, বিবাহ ও ভালোবাসা পর্যন্ত তাহার পূর্বজীবনের সংস্কারকে বিন্দুমাত্র শিথিল করিতে পারে নাই। মাধুর্য ও অনমনীয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গার্হস্থ্যজীবনের ভোগ ও অক্ষুণ্ণ বৈরাগ্য,

সামাজিক বিধিনিষেধের মধ্যে অদম্য স্বাধীনতা—এই সমস্ত বিপরীত-মুখী গুণ কপালকুণ্ডলার চরিত্রে আশ্চর্য সামঞ্জস্যে একীভূত হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলার সংসারানভিজ্ঞতা, নিরাসক্তি ও ধর্মসংস্কারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য তাহার বিবাহোত্তর জীবনের প্রতি চিন্তায় ও কার্যে এমন অব্যভিচারীভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে লেখকের অবিচল অভ্রান্ত নিয়ন্ত্রণশক্তিতে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠি। এমন কি মহাকবি শেকস্‌পিয়র পর্যন্ত তাঁহার মিরাণ্ডার চরিত্র চিত্রণে মধ্যে মধ্যে প্রমাদ ও আত্মবিস্মৃতির পরিচয় দিয়াছেন—সমাজের অভিজ্ঞতাহীন প্রকৃতি-দুহিতার মুখে পাকা সংসারীর উপযুক্ত ভাব ও মন্তব্য আরোপ করিয়াছেন। শেকস্‌পিয়ারের যেখানে পদস্খলন হইয়াছে সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্ছিদ্র ও প্রমাদহীন। বিবাহের নিগূঢ় অভিজ্ঞতালাভের পরেও কপালকুণ্ডলার মূল প্রকৃতি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। নবকুমারের অপরিমিত প্রণয়োচ্ছ্বাসও তাহার চিরউদাসীন মনে রং ধরাইতে পারে নাই। সংসার শত প্রলোভনেও তাহার বন্য, বন্ধনহীন মনকে পোষ মানাইতে পারে নাই। শ্যামার সখিত্ব তাহার মনে করুণা ও সমবেদনার সঞ্চার করিয়াছে, কিন্তু এই করুণা অপরিচিত পথিক নবকুমারের প্রতি তাহার কুমারী-জীবনের স্বতঃ উৎসারিত সহানুভূতির সহিত অভিন্ন; ইহার মধ্যে সমাজবর্ধিত, ননদ-ভাজের রং-চড়ানো প্রীতিসম্পর্কের কোনো গন্ধ নাই। তাই যখন পূর্বজীবন হইতে আবার ডাক আসিয়াছে, মজ্জাগত ধর্মসংস্কার যখন ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করিয়াছে, তখন কপালকুণ্ডলা এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ না করিয়া স্বামীত্যাগ করিয়াছে; সপত্নীর হাতে স্বামীকে তুলিয়া দিয়া তাহার অসমাপ্ত ব্রতসাধনে

ফিরিতে চাহিয়াছে। বিদায়মুহূর্তে নবকুমারের কাতরতা সে ভালো করিয়া বোঝে নাই; তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ অপনোদন করিয়াই সে তাহার কর্তব্য নিঃশেষ করিয়াছে। ভালোবাসার একটা কথা বলিয়াও বিদায়-বেদনার দুঃসহতা একটুও হ্রাস করিতে চাহে নাই। স্বামীকে ব্রাহ্মণকুমার সম্বোধনের মধ্যে তাহার নিরাসক্ত মনের সমস্ত ধূসর রং পুঞ্জীভূত হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলার ধর্মমোহ কেবল একটা অলৌকিকত্ব অবতারণার সুলভ উপায়মাত্র নহে, ইহা তাহার চরিত্রের মূলদেশ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নবকুমারের সহিত যাত্রার প্রাক্কালে দেবীর চরণ হইতে অর্পিত বিল্বপত্রের স্খলন তাহার মন অশুভ আশঙ্কায় পূর্ণ করিয়াছে ও বিবাহবন্ধনে তাহার অনাসক্তি বাড়াইয়াছে। আকাশপটে নীল নীরদজালের মধ্যে আবির্ভূতা ভৈরবী মূর্তি তাহার সংসারত্যাগের অর্ধসচেতন ইচ্ছাকে চূড়ান্ত সংকল্পের রূপ দিয়াছে। এইরূপ দৈবের অঙ্গুলিসংকেত তাহার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহার প্রতি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

উপন্যাসের আর একটি গুণ অনবদ্য গঠনকৌশল। ইহা ঠিক একখানি গ্রীক ট্রাজেডির মত সরল, অবিসর্পিত রেখায় অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। উপন্যাসে যাহা কিছু ঘটিয়াছে সমস্তই এই শেষ পরিণামের কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা রচনা করিয়াছে। দিল্লীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, কপালকুণ্ডলার সংসারে অনাসক্তি, শ্যামার প্রতি সমবেদনা, কাপালিকের প্রতিহিংসা, নবকুমারের সন্দেহ, পদ্মাবতীর স্বামীপ্রেমের পুনরুন্মেষ ও দৈবের রুদ্ধ ইঙ্গিত—এই সমস্ত

শক্তিই একযোগে কপালকুণ্ডলার জীবনকে অন্তহীন রহস্যের অতলে আকর্ষণ করিয়াছে। গঙ্গাগর্ভে তাহার অতর্কিত অন্তর্ধান যেন সাধারণ মৃত্যু নহে, তাহার জন্মমুহূর্ত ও সমস্ত জীবন ঘিরিয়া যে রহস্য-সমুদ্র উদ্‌বেলিত তাহারই তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বুদ্‌বুদ্‌-বিলয়। সাংকেতিকতার এমন অনবদ্য অভিব্যক্তি—আগাগোড়া একই রহস্যের সুরে বাঁধা এমন জীবনকাহিনী উচ্চতম কলাকৌশলের নিদর্শন।

মৃণালিনী (১৮৬৯) 'কপালকুণ্ডলা'র সাংকেতিকতা ও পরিকল্পনা-সুষমা লাভ না করিলেও 'দুর্গেশনন্দিনী'র অপেক্ষা অগ্রগামী। এই শ্রেষ্ঠত্ব চরিত্র-চিত্রণে প্রতীয়মান। হেমচন্দ্রের অভিমান ও অন্যায় হঠকারিতা জগৎসিংহের অপেক্ষা তাহাকে বাস্তবতর করিয়াছে; মৃণালিনী ধৈর্যে ও আত্মত্যাগে তিলোত্তমাজাতীয় হইলেও দুঃখের অভিজ্ঞতা ও চরিত্রের দৃঢ়তার জন্য একেবারে মোমের পুতুল হয় নাই। যে অমার্জিত রসিকতা ও আচরণের মাত্রাহীনতা বিমলার মত সম্ভ্রান্ত পৌরমহিলার পক্ষে অশোভন তাহা ভিখারিনী গিরিজায়ার ক্ষেত্রে সুসংগত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমের উন্নতির প্রধান নিদর্শন মনোরমা চরিত্রের রহস্যময় দ্বৈতভাবের পরিকল্পনায় ও পশুপতির প্রতি বাহ্য বিরোধ ও ঔদাসীন্যের মধ্যে তাহার প্রেমানুভবে। এই দ্বৈতভাবের কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু আচরণে ইহা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

'মৃণালিনী'র ঐতিহাসিক আবেষ্টন-রচনায় পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতা ও বৃদ্ধরাজা লক্ষ্মণসেনের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের পরিকল্পনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সহজসাধ্যতার এইরূপ একটা ব্যাখ্যা অপরিহার্য। তবে

তথ্যের অভাব-জন্য এই প্রতিবেশ-রচনা অনেকটা শূন্যগর্ভ হইয়াছে। পশুপতির সম্পূর্ণ উদ্যোগহীন অবস্থায় শত্রুহস্তে রাজ্যসমর্পণের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে বঙ্কিম সচেতন ছিলেন ও তাহার একটা যেমন-তেমন কৈফিয়ত দিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। কল্পনা দ্বারা ঐতিহাসিক উপাদানের স্বল্পতা যতটা পূরণ করা যায় তিনি তাহা করিয়াছেন। মুসলমানের সহিত ষড়যন্ত্র, বক্তিয়ার খিলিজির কূটনীতি ও 'যবন-বিপ্লব' অধ্যায়ে আক্রমণকারীর হস্তে নবদ্বীপের দুরবস্থা লেখকের আখ্যায়িকা-রচনা ও বর্ণনা-শক্তির চমৎকার উদাহরণ। 'ধাতুমূর্তির বিসর্জন' অধ্যায়ে (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ) লেখকের মানসিক বিপ্লব ও জ্বালাময় শব্দ প্রয়োগের ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা জীবন্ত চিত্র ফুটাইবার অত্যদ্ভুত শক্তির পরিচয় মিলে।

২

'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭) ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত হইলেও ইহাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। ইহাদের মধ্যে অতীত ইতিহাসের চিত্রাঙ্কন লেখকের গৌণ অভিপ্রায়—মুখ্য অভিপ্রায় তাঁহার কাব্যকল্পনা বা ধর্মতত্ত্ব বা দেশপ্রীতির প্রয়োগের অবসর অন্বেষণ। কাজেই এই সমস্ত উপন্যাসে ইতিহাস লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য প্রভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার পূর্বের উপন্যাসগুলিতে যে কল্পনার সক্রিয়তা দেখা যায়, তাহা রন্ধ্রপূরণের জন্য, কালের প্রবাহ যাহা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, কল্পনার ভাণ্ডার হইতে তাহার বিকল্প সরবরাহের জন্য। কিন্তু এই

যুগের উপন্যাসগুলিতে লেখকের প্রতিপাদ্য উদ্দেশ্যের খাতিরে ইতিহাসের বহির্ঘটনা ও অন্তঃপ্রকৃতিকে যথেষ্ট পরিবর্তিত ও প্রসারিত করা হইয়াছে। কল্পনার বর্ণোচ্ছ্বাস ও আদর্শ-সুষমা ইতিহাসের ধূসর, বন্ধুর ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহার কঠিন বস্তুতন্ত্রতা দ্রবীভূত হইয়া লেখকের বিরাট পরিকল্পনার ছাঁচে পরিণত হইয়াছে। অতীত যুগের অস্পষ্ট ইতিহাস লেখকের কল্পনা ও বিশেষ অভিপ্রায়কে অব্যাহত স্বাধীনতা দিয়াছে মাত্র। 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের মহনীয়তা, 'আনন্দমঠে' স্বদেশপ্রেমের মহিমান্বিত আদর্শ, 'দেবী-চৌধুরাণী'তে দেশপ্রীতির সহিত মিশ্রিত নিষ্কাম ধর্মসাধনার গৌরব-ঘোষণা, 'সীতারামে' গীতার ধর্মতত্ত্ব প্রতিপাদন—এইগুলিই বঙ্কিম-চন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; ইতিহাস এই উদ্দেশ্যসাধনের একটা নাতি-প্রয়োজনীয় অংশ মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের বহির্ঘটনাগুলি যতদূর সম্ভব অবিকৃত রাখিয়াছেন; কিন্তু ইহাদের মর্মবাণীর সুরটি বদলাইয়া তাঁহার আদর্শবাদের বীণার তারে যোজনা করিয়াছেন। কাজেই এই উপন্যাসগুলির ঐতিহাসিকতা রোমান্সের আতিশয্যে অনুরঞ্জিত ও আদর্শবাদের নিয়ন্ত্রণে অনেকাংশে কক্ষচ্যুত।

'চন্দ্রশেখরের' কেন্দ্রস্থ সমস্যা শৈবলিনীর প্রতাপের প্রতি আকর্ষণ। এই আকর্ষণের প্রভাবে অনেকটা স্বেচ্ছায় ফস্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগ এবং প্রতাপ কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের পর মনোবিকার ও উৎকট প্রায়শ্চিত্ত। শৈবলিনী-চরিত্রের দুরবগাহ জটিলতা বঙ্কিমচন্দ্র মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দিক্ দিয়া কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার প্রমাণ। প্রতাপের প্রতি তাহার বাল্যপ্রণয়, বিবাহিত জীবনের আট বৎসর-ব্যাপী অতৃপ্তি ও

অবদমনের পর, ফস্টরের রূপমোহের আশ্রয়ে, অতর্কিতভাবে তীব্র বিস্ফোরক শক্তিতে বহির্নিক্রমণ করিয়াছে। প্রতাপকে না বুঝিয়া সে তাহাকে পাইবার জন্য কতই না বিপদসংকুল ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে, পরিবারের নিভৃত আশ্রয় ছাড়িয়া নবাবের দরবারে হাজির হইয়াছে ও রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাতের গতিবেগের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার প্রাণান্ত চেষ্টার পর যখন প্রতাপ সম্বন্ধে তাহার সমস্ত আশা উন্মূলিত হইয়াছে, তখন এই সুদীর্ঘ একাগ্র সাধনার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ তাহার মনের উপর দিয়া ভূমিকম্পের তীব্র আন্দোলন বহিয়া গিয়াছে। ইহার উপর রামানন্দ স্বামীর অলৌকিক যোগবল সঞ্চারিত হইয়া তাহার অন্তর-রাজ্য এক যুগান্তরকারী আধ্যাত্মিক অনুভূতি-পরম্পরার অভিঘাতে মথিত হইয়াছে। মিল্‌টন ও দান্তের মত মহাকবিরা যে নরকের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারই বিভীষিকাময়, অনুতাপের অন্তর্জ্বালায় অসহনীয়, মানস বিকারের বাষ্পোচ্ছ্বাসে বিকৃত প্রতিচ্ছবি তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে অভিভূত করিয়াছে। এই তুষানলে তাহার সমস্ত কলুষিত প্রবৃত্তি নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া সে যেন নিষ্পাপ শিশুর মত নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। শৈবলিনীর এই মনোবিকার ও প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা বিজ্ঞানসম্মত, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিধি অতিক্রম করিয়া মহাকবির নিগূঢ়নিয়মবদ্ধ, অথচ বিশ্লেষণাতীত কল্পনার ঊর্ধ্বরাজ্যে উন্নীত হইয়াছে

শৈবলিনী ও দলনীর ভাগ্যসূত্রের একত্র গ্রন্থন বঙ্কিমের ঘটনা-সমাবেশ কৌশলের চরম উদাহরণ। রাজনৈতিক ঝটিকা দরিদ্র গৃহস্থ বধূ ও নবাবের প্রেয়সী বেগম উভয়কেই এক সর্বনাশের সাধারণ

ক্ষেত্রে সমবেত করিয়াছে। দলনীর ভাগ্যলিপি আরও করুণ ও মর্মস্পর্শী। সে স্বামীর অমঙ্গল সম্ভাবনায় আশঙ্কিত হইয়া একবার যেই দুর্গের বাহিরে পা দিয়াছে, অমনি সে ক্রূর, ক্ষমাহীন নিয়তির ক্রীড়নক হইয়াছে। তাহার দুর্গপ্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। চন্দ্রশেখরের সহায়তা ও আশ্রয়দান তাহাকে ইংরেজের কবলে নিক্ষেপ করিয়া নবাবের আগতপ্রায় ক্ষমার স্পর্শাতীত দূরে অপসরণ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তকি খাঁর ভুল তাহার উদ্বন্ধন-রজ্জুতে শেষ ফাঁস যোজনা করিয়া তাহার উপর নবাবের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার চরম শাস্তি আনিয়া দিয়াছে। নিয়তির বিষপাত্র নিজ অন্তর-মধুর ক্ষরণে সুমিষ্ট করিয়া দলনী পান করিয়াছে ও জীবনমূল্যে নিয়তির নিপীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

'চন্দ্রশেখরে'র মধ্যে চমকপ্রদ সংঘটনের জীবন্ত, কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা ও আবেগ-গভীরতাপূর্ণ, অন্তরের ঐশ্বর্যাভিব্যক্তিতে মহীয়ান দৃশ্যের অসদ্ভাব নাই। ইংরেজের নৌকা হইতে প্রতাপের উদ্ধার, আমিয়টের নৌকা আক্রমণ ও ইংরেজের মৃত্যুভয়হীন প্রতিরোধ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধবিগ্রহের জটিল উন্মাদনা—এ সমস্তই বঙ্কিমের বর্ণনাশক্তির দ্বারা আমাদের নিকট চিত্তাকর্ষক ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গভীর ভাবৈশ্বর্যের উদাহরণ স্বরূপ মীরকাসেমের অগ্নিস্রাবের ন্যায় অসহনীয় অনুতাপ ও খেদ, সুষুপ্তা শৈবলিনীর সম্মুখে চন্দ্রশেখরের আত্মগ্লানিপূর্ণ স্বগতোক্তি, শৈবলিনী ও প্রতাপের গঙ্গাসন্তরণকালে পরস্পরের চিত্তগভীরতার পরিমাপ ও সম্বন্ধচ্ছেদ, দলনীর বিষপান, মরণপথযাত্রী প্রতাপের রুদ্ধপ্রেমের

জ্বালাময় অভিব্যক্তি, শৈবলিনীর গভীর চিত্তবিপর্যয়—ইত্যাদি দৃশ্যগুলি সহজেই উল্লিখিত হইতে পারে। উপন্যাসের ভাষা সময় সময় অযথা শব্দভারাক্রান্ত হইলেও গভীর ভাবপ্রকাশের অনুপযোগী নহে। নিদ্রিতা শৈবলিনীর সৌন্দর্য বর্ণনা, প্রতারণাশীল প্রভাতবায়ুর বিপদ্‌গর্ভ ক্রীড়াশীলতা, শৈবলিনীর পর্বতারোহণের পর ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপ্লব ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনায় বঙ্কিমের ব্যঞ্জনাপূর্ণ কবিত্বময় ভাষাপ্রয়োগ চমৎকার সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

'আনন্দমঠে'র (১৮৮২) পটভূমিকা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও দেশব্যাপী অরাজকতা। এই সময়ে একটা অখ্যাত সন্ন্যাসী-উপদ্রব সত্যই ঘটিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য লুটতরাজের দ্বারা খাদ্যসংগ্রহ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই অতি তুচ্ছ ঘটনায় এক যুগান্তরকারী আদর্শ মহিমা, এক সুদূরপ্রসারী অর্থগৌরব আরোপ করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ যুগের বাঙালীর মনে দীপ্ত, সর্বত্যাগী, আধ্যাত্মিকতা-পূত স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করিবার জন্য যে অতীতে দেশাত্মবোধই জাগ্রত হয় নাই সেই অতীতে ইহার সাধনাক্ষেত্র কল্পনা করিয়াছেন। অদূরবর্তী ইতিহাসের এরূপ বিকৃতিসাধন অসমসাহসিকতার নিদর্শন। কাজেই 'আনন্দমঠকে' ঠিক ঔপন্যাসিক আদর্শে বিচার করা সংগত হইবে না। ইহার মৌলিক প্রেরণা বাস্তব বিবৃতি নহে; স্বাদেশিকতার নবধর্মপ্রচার। ইহার আন্দোলনের উদ্ভব ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিণতি সম্বন্ধে লেখক কোনো আলোকপাত করেন নাই। ইহার নায়কেরা হয় অতিমানব, না হয় কৃচ্ছ্রসাধনার প্রভাবে মানবিক ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত। সত্যানন্দ ও তাঁহারও নিয়ন্তা

মহাপুরুষকে বাস্তব নিয়মাধীন মনে করা যায় না। তাঁহাদের অধীনস্থ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভবানন্দ রূপমোহে আত্মসমর্পণ ও জীবানন্দ তাঁহার দাম্পত্য সম্পর্কের অভিনবত্ব ও সরস আচরণের জন্য কতকটা মানবধর্মান্বিত হইয়াছেন। শান্তির ব্যবহারের অসাধারণত্ব তাহার পূর্বজীবনবর্ণনার দ্বারা কতকটা সম্ভাবনীয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাদের সহিত তুলনায় মহেন্দ্র ও কল্যাণী সত্য সত্যই রক্তমাংসের মানুষ—সন্তানধর্মের আদর্শবাদ ইহাদিগকে অবাস্তব করিয়া তোলে নাই। যুদ্ধবর্ণনা ও ইংরেজকে বোকা বানানর কাহিনীতে আমাদের আত্মাভিমান তৃপ্ত হয়, কিন্তু সত্যনিষ্ঠা অতৃপ্ত থাকে। এই অস্পষ্ট, বাষ্পাকুল প্রতিবেশ হইতে দুর্ভিক্ষের করাল চিত্রটি, ইহার তাড়নায় মানুষের পশুত্বে পরিণতির ভয়াবহ ইঙ্গিতটি যেন আগুনের রেখায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নগ্ন, তীক্ষ্ণাগ্র বাস্তব-বর্ণনায় বঙ্কিমের যে কি অসামান্য অধিকার ছিল, তাহা ঐ কয়েকটি অধ্যায়েই পূর্ণ-প্রকটিত হইয়াছে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কয়েকটি বহির্লক্ষণ অবলম্বন করিয়া কল্পনাসমৃদ্ধ নূতন আদর্শ প্রচারকারী ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহার 'বন্দে মাতরম্' গীতটির প্রতি আমাদের মনোভাব ইহার আবেদনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে।

'দেবীচৌধুরাণী'তে (১৮৮৪) বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার হইলেও ইহার বাস্তব সমৃদ্ধি সেই উদ্দেশ্যকে অধঃকৃত করিয়া ইহাকে খাঁটি সামাজিক উপন্যাসের পদবী দিয়াছে। প্রফুল্লের মধ্যে নিষ্কাম ধর্ম কতখানি মূর্ত হইয়াছে, পাঠক সে সম্বন্ধে মোটেই অবহিত থাকে না। কেননা প্রফুল্ল নিজেই তাহার ধর্মসাধনা সম্বন্ধে আত্মসচেতন নহে।

ভবানী পাঠকের শিক্ষা ও অনুশাসন তাহার রমণীসুলভ কমনীয়তা ও গৃহিণীপনার আকাঙ্ক্ষাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তাহার হৃদয়ে বৈকুণ্ঠেশ্বর কোনোদিনই ব্রজেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রকৃতির উপর জোর করিয়া আরোপিত আদর্শের বিরুদ্ধে সে বারবার বিদ্রোহ করিয়াছে—রানীগিরির অভিনয় তাহার একদিনও ভালো লাগে নাই। সাংসারিক কর্তব্যের নিকট যেটুকু আত্মবিসর্জন বঙ্গরমণীর অস্থিমজ্জাগত, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট রহিয়াছে। অবশ্য দিবা-নিশার দার্শনিক আলোচনা ও সূত্র-কারণহীন উপস্থিতি তাহার চারিদিকে এক আদর্শবাদের আবহাওয়া রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু প্রফুল্ল এই ধর্ম-প্রতিবেশে নিজ নির্লিপ্ততা রক্ষা করিয়াছে। সপত্নী-কণ্টকিত গৃহে বাস করিতে হইলে গীতার নিষ্কাম ধর্ম প্রয়োগের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাহা লইয়া আড়ম্বর করা চলে না। ভবানী পাঠকের দেশসেবাব্রত, সত্যানন্দের সহিত তুলনায়, বিশ্বাস্য ও সম্ভব। ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি আদর্শস্থানীয় হইলেও তাহার সাংসারিক আবেষ্টন ও দাম্পত্য সমস্যা তাহার বাস্তবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। হরবল্লভের ঘোর স্বার্থপর, নীচাশয় বৈষয়িকতা ও বংশ-মর্যাদাভিমান তাহাকে আমাদের নিতান্ত ঘরোয়া জগতের অধিবাসী করিয়াছে। ত্রিস্রোতাবক্ষে বজরার ছাদে ম্লানজ্যোৎস্নাপ্লাবিত রহস্য-ময়ী রজনীতে সঙ্গীতালাপের মধ্য দিয়া দেবীর নিগূঢ় অন্তর বেদনার বহিঃপ্রকাশ—বঙ্কিমের প্রকৃতি-বর্ণনার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতির সাংকেতিক আভাসের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন।

'সীতারামে'ও (১৮৮৭) ধর্মপ্রভাব বাস্তব-চিত্রণকে অভিভূত করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সেই ধর্মতত্ত্ব মানবচরিত্রাভিজ্ঞতার সহিত সমার্থবাচক ও অভিন্ন। শ্রীর সহিত সীতারামের বিচ্ছেদ যে জ্যোতিষ-গণনায় বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত তাহা আধুনিক যুগেও আমাদের জীবনে কার্যকরী। সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর সাহচর্যে শ্রীর অস্বাভাবিক আত্ম-নিগ্রহকে দৃঢ়তর করিয়া সীতারামের সর্বনাশের পথ প্রশস্ততর করিয়াছে, কিন্তু ধর্মান্ধতার মোহে সুস্থ দাম্পত্যমিলনের প্রতিরোধ আমাদের সাংসারিক জীবনে খুব সাধারণ সংঘটন। সীতারামের চরিত্রের উদারতা, অতৃপ্ত রূপমোহের রন্ধ্রপথ দিয়া সেখানে দুর্বলতার শনির প্রবেশ, শ্রীর সহিত মিলনের আশাভঙ্গের নিদারুণ আঘাতে তাঁহার রক্তপিপাসু, ইন্দ্রিয়পরায়ণ পশুতে পরিণতি ও চরম বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার অতর্কিত নৈতিক পুনরুদ্ধার—এই সমস্ত পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার কার্যকারণশৃঙ্খলাটি অতি সুকৌশলে গ্রথিত হইয়াছে। অন্ধ ধর্মমোহ তাঁহার অধঃপতনের গতিবেগ বর্ধিত করিয়াছে, কিন্তু ইহার স্বাভাবিকতার কোনো ব্যত্যয় করে নাই। শ্রী জয়ন্তীর আওতায় অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়াছে, কিন্তু ফৌজদারের সহিত দাঙ্গার দিনে তাহার বৃক্ষারূঢ় সিংহবাহিনী মূর্তিই তাহার সত্য পরিচয়। সীতারাম রাজ্যস্থাপনায় তাহাকে রাজলক্ষ্মীরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার আশাভঙ্গের ফল এরূপ মর্মান্তিকরূপে নিদারুণ হইয়াছে।

উপন্যাস মধ্যে সর্বাপেক্ষা জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে রমা। বাঙালী ঘরের স্নেহদুর্বলা, সন্তানবৎসলা নারী হঠাৎ যুদ্ধবিগ্রহের

আবেষ্টনে পড়িলে যেরূপ ব্যাকুল ও বিমূঢ় হইয়া পড়ে, রমার ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইয়াছে। তাহার আশঙ্কাই তাহাকে অসমসাহসিকতায় উত্তেজিত করিয়াছে। সেই অজ্ঞাতসারে গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতার কারণ হইয়া, সীতারামের রাজ্যধ্বংসকে ও তাঁহার নৈতিক অধঃপতনকে আসন্নতর করিয়াছে। বিচারালয়ের জনাকীর্ণ, অনভ্যস্ত প্রতিবেশে সে নিরপরাধিনীর আত্মপ্রত্যয় ও পদোচিত মর্যাদাবোধ ফিরিয়া পাইয়াছে। জয়ন্তী ঠিক জীবন্ত চরিত্র নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স-প্রাসাদের গৃহসজ্জোপকরণ মাত্র, সন্ন্যাসধর্মের নির্বিকারতার প্রতীক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে চরম পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া তাহার নিরাসক্তির অভিমান চূর্ণ করিয়া তাহার মুখ হইতে লজ্জাভিভূতা রমণীর অসহায় আর্তধ্বনি বাহির করিয়াছেন। উদ্বেল বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্র বর্ণনায় ও বিভিন্ন উপলক্ষে তাহার ভাববৈলক্ষণ্য ফুটাইবার ক্ষমতায় বঙ্কিমের অসাধারণ অধিকার। গঙ্গারামের উদ্ধার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা, রমা ও গঙ্গারামের বিচার ও জয়ন্তীর বেত্রদণ্ডাজ্ঞা এই তিনটি দৃশ্যে প্রমাণিত হইয়াছে। 'সীতারাম' ধর্মতত্ত্বের অনুচিত প্রভাবে ঔপন্যাসিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই—ইহা শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডির ন্যায় আমাদিগকে মানবমনের রহস্যময় দুর্জ্ঞেয়তায় অভিভূত করিয়া ফেলে।

৩

'রাজসিংহ'কে (১৮৮১) বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার একমাত্র প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া দাবি করিয়াছেন। ইহার কারণ বোধ হয় যে অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত তুলনায় লেখক এখানে

ইতিহাসের সত্যকে অবিকৃতভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ সম্ভবতঃ এই যে এখানে ইতিহাসই উপন্যাসের মধ্যে সর্বপ্রধান অংশ অধিকার করে। আমরা পূর্বেই (তৃতীয় অধ্যায়) দেখিয়াছি যে বঙ্কিম ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসারে সত্যনিষ্ঠার আদর্শই অসম্ভবরূপে উচ্চ হইয়া পড়ে। কাজেই 'রাজসিংহের' সহিত অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে কোনো মৌলিক প্রভেদ আছে তাহা না মানিলে চলে—যে পার্থক্য আছে তাহা ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশের তারতম্যমূলক। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ রাজসিংহ-আরংজীবের যুদ্ধবিগ্রহ, রাজপুত-মোগলের শক্তি-পরীক্ষার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, সুপরিচিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নর-নারী হইতেই তাঁহার উপন্যাসের পাত্রপাত্রী নির্বাচন করিয়াছেন। তথাপি তিনি কল্পনাকে একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই। জেব-উন্নিসার অসংখ্য প্রণয়ীর মধ্যে মবারকের ন্যায় মহানুভব, দৃঢ় চরিত্র পুরুষ, চঞ্চলকুমারীর সখিবৃন্দের মধ্যে নির্মলকুমারীর ন্যায় চতুরা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যসম্পন্না সহচরী, ও রাজসিংহের সভাসদবর্গের মধ্যে মাণিক-লালের ন্যায় কূটনীতিবিশারদ ও অসমসাহসিক সেনানীকে কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণের জন্য বাদশাহ ও রাণার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনীতে ঐতিহাসিক সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু লেখক ইহার উপর কল্পনার রং চড়াইয়া ইহার মধ্যে চঞ্চলকুমারী কর্তৃক রাণার প্রতি আমন্ত্রণ ও বাদশাহের প্রতি অবজ্ঞা-সূচক প্রত্যাখ্যানের সরস বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহাকে রোমান্সের পর্যায়ে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। আরংজীবের চরিত্র ও রাজপুত-

যুদ্ধের বিবরণ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক প্রমাদমুক্ত কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে রাজসিংহকে লেখক যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য নাও হইতে পারে।

এই উপন্যাসে ইতিহাসের প্রাধান্য চরিত্রসৃষ্টিকেও প্রভাবিত করিয়াছে। চঞ্চল, নির্মল, দরিয়া, মানিকলাল—ইহারা সকলেই ইতিহাসের বিদ্যুদগ্নিগর্ভ আকাশ-বাতাসের তলে, তাহার তুমুল বিক্ষোভের পরিধির মধ্যে, জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়াছে। তাহাদের ব্যক্তিগত পরিচয় তাহাদের ঐতিহাসিক দায়িত্বের নিচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাবাবেগ পরিণতির ধীর-মন্থরগতি এখানে নির্মমভাবে সংকুচিত ও ব্যাহত হইয়াছে। চঞ্চলকুমারীর বালিকাসুলভ চাপল্য প্রলয়াগ্নি জ্বালাইয়াছে; তাহার প্রেম ব্যক্তিগত রুচি ছড়াইয়া উচ্ছ্বসিত দেশপ্রীতির নিকট মাথা নোয়াইয়াছে। মুহূর্তমধ্যে চরিত্রের অভাবনীয় পরিবর্তন সংসাধিত হইতেছে। দস্যু মানিকলাল চক্ষের নিমিষে দেশভক্ত বীরে রূপান্তরিত হইয়াছে। নির্মলের বিবাহ ও দাম্পত্যসম্পর্ক রাজনৈতিক প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এইরূপে বিপুল ইতিহাস ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনকে অভিভূত করিয়া ইহার মধ্যে নিজ প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে।

অবশ্য ইতিহাসের একাধিপত্যের মধ্যেও বঙ্কিম মানবচিত্তের স্বাধীন মর্যাদা যতদূর সম্ভব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার রাজনৈতিক কারণ ছাড়া মানসিক

সংঘর্ষমূলক কারণও দিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি এমন কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাদের গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা ইতিহাস-সংস্রব-নিরপেক্ষ। দরিয়া ইতিহাসের বিপর্যয়ের মধ্যে একাগ্র তন্ময়তার সহিত নিজের হৃদয়াবেগেরই অনুসরণ করিয়াছে। অবারক ইতিহাস-যন্ত্রের সহিত জড়িত হইয়া পড়িলেও নিজ আত্মার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। জেবউন্নিসা ও দরিয়ার মধ্যে তাহার দোদুল্যমান অনুরাগ, মোগলপক্ষ ত্যাগ ও পুনরবলম্বন, অবৈধ প্রণয়ের বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ—এই সমস্তই তাহার নিজস্ব হৃদয়সমস্যা। তাহার মৃত্যু আসিয়াছে ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বার দিয়া নহে, তাহার প্রণয়ঘটিত অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। জেবউন্নিসার চরিত্রেও ইতিহাসের উপর হৃদয়াবেগের জয় বিঘোষিত হইয়াছে। শাহজাদী নিজ উচ্চ পদবীর অহংকারে যে প্রেমের মর্যাদাকে অস্বীকার করিয়াছিল, সেই প্রেম তাহার সমস্ত গর্ব চূর্ণ করিয়া তাহাকে অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ করিয়া তাহাকে সাধারণ মানবীর পর্যায়ে নামাইয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের চরম অবমাননা ও বিপদের মধ্যে কূটরাজনীতিবিশারদ জেবউন্নিসা নিজ অসহ্য হৃদয়বেদনার মধ্যে ডুবিয়া সমস্ত বহির্জগৎ সম্বন্ধে চেতনা হারাইয়াছে। এই সমস্ত চরিত্র ও তাহাদের সমস্যার জন্যই 'রাজসিংহ' ইতিহাসের অনুবর্তন করিয়াও উচ্চ উপন্যাসোচিত গুণে মণ্ডিত হইয়াছে। অবশ্য দ্রুত-সঞ্চারী ঘটনার ভিড়ে সূক্ষ্ম চরিত্রবিশ্লেষণের অবসর অপেক্ষাকৃত অল্প; চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বদ্যোতক গুণ অপেক্ষা শ্রেণীপ্রতিনিধিত্বের লক্ষণই অধিকতর পরিস্ফুট। একমাত্র সম্রাট

আরংজীব নির্মলকুমারীর সরস বাক্‌চাতুর্য ও অসাধারণ সাহসে মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট নিজ রাজকীয় মর্যাদা ভুলিয়া অন্তরের নিঃসঙ্গতার বেদনা অনাবৃত করিয়াছেন। আখ্যায়িকা হিসাবে, উদ্দীপনাপূর্ণ যুদ্ধবিগ্রহের চিত্তাকর্ষক বর্ণনায় ও অনবদ্য গঠনকৌশলে 'রাজসিংহ' অতুলনীয়।

৪

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলির আলোচনা হইবে। চারিখানি পূর্ণাঙ্গ ও দুইটি ক্ষুদ্রাবয়ব উপন্যাসকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে—'বিষবৃক্ষ' (১ জুন, ১৮৭৩); 'ইন্দিরা' (১৮৭৩); 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪); 'রাধারাণী' (১৮৭৫); রজনী (২ জুন ১৮৭৭) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (২৯ আগষ্ট, ১৮৭৮)। ইহাদের মধ্যে 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' আয়তনের দিক দিয়া উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্পের অনুরূপ, যদিও আঙ্গিকের দিক দিয়া ছোটগল্পের সহিত ইহাদের বিশেষ মিল নাই। 'যুগলাঙ্গুরীয়' গল্পে এক অজ্ঞাত অতীত যুগে জ্যোতিষশাস্ত্রের সমস্ত বাধা কাটাইয়া ও আন্তরিক অনুরাগের পরীক্ষায় জয়ী হইয়া পুরন্দর ও হিরণ্ময়ীর প্রেম বিবাহে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহার প্রধান সমস্যা বাহিরের প্রতিবন্ধক উল্লঙ্ঘন; ইহা ছাড়া লেখক আর কোনো গভীরতর সমস্যার অবতারণা করেন নাই। 'রাধারাণীতে' রুক্মিণীকুমারের সহিত রাধারাণীর মিলন নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও লেখকের অত্যুৎসাহ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। একদিন রাত্রে একটি অনাথা বালিকার প্রতি দয়া দেখাইয়া সাত বৎসর পরে তাহাকে বিবাহ করার দুরাকাঙ্ক্ষা

আমাদের বাস্তবজীবনে প্রায় সফল হয় না। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র জোর করিয়া এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে রাধারাণীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা একেবারে অস্বাভাবিক না ঠেকে। শেষ পর্যন্ত নানারূপ গোঁজামিল দিয়া লেখক বাস্তবজীবনে রূপকথার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য প্রতিফলিত করিয়াছেন। বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে এমন একটা ছেলেমানুষি গল্পের মধ্য দিয়াও তিনি মাধুর্যসঞ্চার করিয়াছেন ও ইহার পরিসমাপ্তিকে নিতান্ত বিসদৃশ হইতে দেন নাই।

'ইন্দিরা' ও 'রজনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র বিবৃতির একটি নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। লেখক নিজে অন্তরালবর্তী হইয়া উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের উপরই গল্প বলিবার ভার দিয়াছেন। 'ইন্দিরা'তে নায়িকাই আগাগোড়া বক্ত্রীর স্থান অধিকার করিয়াছে। সমস্ত গল্পের মধ্য দিয়া তাহার সরস, কৌতুকপ্রিয় প্রকৃতিটি, ভাগ্যবিপর্যয়েও অদমনীয় রঙ্গপ্রবণতা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। বিবৃতির মধ্যে সর্বত্রই রমণীসুলভ কমনীয়তার সুর প্রস্ফুট; কোথাও পুরুষোচিত দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসপ্রবণতার লেশমাত্র স্পর্শ নাই। স্বামীর সহিত পুনর্মিলিত হইবার জন্য ইন্দিরা যে জটিল ষড়যন্ত্রজাল পাতিয়াছে, তাহার সমস্ত গ্রন্থিই সমান বিচারসহ নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিজেকে বিদ্যাধরীরূপে স্বামীর উপর চালান খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। স্বামীর অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ও কুসংস্কারপ্রবণতার উপর জোর দেওয়া হইলেও ইহার মাত্রাধিক্য সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করে। গ্রন্থের চরিত্রগুলি—রঙ্গপ্রিয়া ইন্দিরা, কারুণ্য ও সমবেদনায় কোমলা সুভাষিণী, সংকীর্ণমনা 'কালির বোতল' গৃহিণী, ঈর্ষাপ্রবণা পাচিকা

সোনার মা—সকলেই স্বল্পপরিসরে খুব জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত উপন্যাসটি প্রাণের উচ্ছ্বসিত প্রবাহে চঞ্চল, তীক্ষ্ণ পরিহাস-নিপুণতায় উপভোগ্য ও বিশুদ্ধ হাস্যরসে মধুর।

'রজনী'তে অন্ধ নারীর অনুভূতিবৈচিত্র্য ও প্রেমসঞ্চারের জটিল মানসপ্রতিক্রিয়া প্রধান বর্ণনীয় বস্তু। অন্ধের রূপোন্মাদের তির্যক্, চক্ষুহীনতায় প্রতিরুদ্ধ, অভিব্যক্তি, শব্দ-স্পর্শের ভিতর দিয়া তাহার দেহমনে প্রেমের অমৃতস্পর্শ সুষ্ঠু মনস্তাত্ত্বিকতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। রজনীর কোমল প্রেমবিহ্বলতা, অমরনাথের দার্শনিক চিন্তাশীলতা ও সংসারবিমুখ পরোপকারেচ্ছা, শচীন্দ্রের পারিবারিক কর্তব্যপরায়ণতার সহিত বংশমর্যাদাভিমান ও শেষ পর্যন্ত অকস্মাৎ উদ্বোধিত প্রেমের নিকট অসহায় আত্মসমর্পণ, লবঙ্গলতার ক্ষুরধার রসনা ও প্রচ্ছন্ন স্নেহশীলতা—প্রত্যেক চরিত্রেরই বিশিষ্ট মনোভাব সুন্দররূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

'রজনী'তে 'ইন্দিরা'য় প্রবর্তিত প্রণালী আরও ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইয়াছে। এখানে প্রত্যেক চরিত্রই, গ্রন্থের যে অংশের সহিত সে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা বর্ণনা করিবার দায়িত্ব লইয়াছে। এই প্রণালীতে সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। আখ্যায়িকার প্রত্যেক অংশ বিভিন্ন চরিত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবৃতি বলিয়া ও লেখকের মধ্যবর্তিতা বর্জনের জন্য, বর্ণনা খুব জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হওয়ার সম্ভব। অসুবিধা দ্বিবিধ—বিভিন্ন বক্তার প্রকৃতির সহিত তাহার ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়; একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন লোকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচিত হয় বলিয়া ঘটনার

অগ্রগতি ব্যাহত হইয়া পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম অসুবিধা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। চরিত্রানুযায়ী ভাষার বিভিন্নতা আয়ত্ত হয় নাই—সকলের মুখেই একই প্রকারের ভাষা—যাহা বাস্তবিকই লেখকের ভাষা—ধ্বনিত হইয়াছে। রজনীকে পরে যেভাবে দেখিয়াছে ও সে নিজে যেভাবে আত্ম-বিশ্লেষণ করিয়াছে এই উভয়ের মধ্যে গুরুতর অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। অপরের চোখে সে যতটা সরল, সংসারানভিজ্ঞ, লজ্জাভিভূত বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহার নিজের উক্তির মৃদু বিদ্রূপমণ্ডিত বিশ্লেষণ কুশলতা অনেকটা তাহার বিপরীত ধারণার সৃষ্টি করে। তাহার মুখে যে সমস্ত দার্শনিকোচিত মন্তব্য ও সংসারাভিজ্ঞতার পরিচয় আরোপিত হইয়াছে তাহা তাহার চরিত্রের সহিত ঠিক খাপ খায় না। কেবল অমরনাথের ক্ষেত্রে উক্তি ও প্রকৃতির সংগতি লক্ষ্য হয়। লবঙ্গলতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত একেবারে গ্রাম্যরমণীসুলভ দৈবশক্তিতে অন্ধ-বিশ্বাসের সামঞ্জস্যসাধনও একটু দুরূহ। ঘটনাবিন্যাসকৌশলে বঙ্কিম দ্বিতীয় অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া উঠিয়াছেন—উপন্যাসের বিভিন্ন অংশ এরূপ নিপুণতার সহিত বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে যে ইহার অগ্রগতি প্রায় অব্যাহত রহিয়াছে। সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির দ্বারা শচীন্দ্রের বিমুখ চিত্তে প্রণয়সঞ্চার ও রজনীর জন্মান্ধত্বের আরোগ্য অন্ততঃ সামাজিক উপন্যাসে লেখকের অনুচিত রোমান্স-প্রবণতার প্রমাণ বলিয়াই ঠেকে।

৫

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের

মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও তাঁহার পূর্ণ শক্তির নিদর্শন। এই দুই উপন্যাসে বঙ্কিম মানবমনের প্রলোভন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীবনসমুদ্রমন্থনে যে বিষ ও অমৃত ফেনাইয়া উঠে, ক্ষণিক মোহের রন্ধ্রপথে যে নিয়তির দারুণ অভিশাপ ও অনিবার্য্য শাস্তি জীবনকে অভিভূত করে, তাহার গভীর বেদনাবিদ্ধ উপলব্ধি ও সূক্ষ্ম, রসসমৃদ্ধ আলোচনার পরিচয় দিয়াছেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে কার্যকারণ শৃঙ্খলা অমোঘ নিয়মানুবর্তিতার সহিত রচিত হইয়াছে, ভ্রান্তি চরম প্রায়শ্চিত্তকে আবাহন করিয়াছে—রোমান্সের সুলভ সমাধান, অনুকূল দৈবের অনুগ্রহ হতভাগ্য মানুষের জীবনসমস্যাকে সরল করে নাই। মানব মনের নিগূঢ় প্রক্রিয়া, প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, আত্মদমন চেষ্টার ব্যর্থ ব্যাকুলতা, প্রতিবেশের সাংঘাতিক প্রভাব, মোহভঙ্গে অনুশোচনার অসহ্য তীব্রতা, অপ্রাপনীয়ের জন্য বিফল হস্তপ্রসারণ, বিরোধের তুমুল বিক্ষোভে উচ্চনীচ প্রবৃত্তির অপ্রত্যাশিত স্ফুরণ—অন্তররাজ্যের আলোড়নের এই বিচিত্র ও মর্ম্মস্পর্শী ইতিহাস গভীর সহানুভূতি, মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও সৌন্দর্যসৃষ্টিকুশলতার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই দুইখানি উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও আলোচনাপদ্ধতি অনেকটা এক প্রকার। উভয়ত্রই পুরুষের রূপমোহ ও প্রবৃত্তি-দমনে অক্ষমতা অশান্তি ও অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। উভয়ত্রই পদস্খলনের পূর্বে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রবৃত্তিচরিতার্থতার পর মোহভঙ্গ ও আত্মগ্লানি দুষ্কৃতকারীর চিত্তে তুষানল জ্বালিয়াছে। উভয়ত্রই প্রলোভনের নিকট আত্মসমর্পণের ফলে বিষাদময় পরিণতি

সংঘটিত হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনী ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমর আত্মবিসর্জনের দ্বারা ন্যায়নীতির বিচলিত ভারসাম্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রথম উপন্যাসে প্রলোভনের চিত্রটি বড় করিয়া আঁকা, ও প্রায়শ্চিত্তের চিত্রটি সংক্ষেপে সারা হইয়াছে; দ্বিতীয় উপন্যাসে ইহার ঠিক বিপরীত প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে—এখানে পদস্খলনের কাহিনী সংক্ষিপ্ত ও শাস্তির কাহিনী পূর্ণতর করা হইয়াছে। তা ছাড়া নায়ক-নায়িকার চরিত্র ও আনুষঙ্গিক ঘটনাসমূহও উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্যার অভিন্নত্বের মধ্যেও আলোচনার বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথের রূপমোহের ক্রমপরিণতি বঙ্কিমচন্দ্র সূক্ষ্ম, সার্থক আভাস-ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন—আধুনিক বাস্তবতা-প্রধান ঔপন্যাসিকের ন্যায় তথ্যবহুল ও দিনলিপির ন্যায় তুচ্ছতম ঘটনার উল্লেখে সন্দেহাতীত করেন নাই। পাপের প্রতি বিমুখতার জন্য, কতকটা সুরুচিরক্ষার প্রয়োজনে তিনি কোথাও পাপ-চিত্রের বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। প্রথম, সূর্যমুখীর অন্তর্দৃষ্টিই নগেন্দ্রনাথের রূপমোহের অঙ্কুরাবস্থার সন্ধান পাইয়াছে; নগেন্দ্রনাথের আচরণ বৈলক্ষণ্যে এই চিত্তবিকারের পোষক প্রমাণ মিলিয়াছে। নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর প্রথম সাক্ষাতে নগেন্দ্রের অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাস স্বভাব-ভীরু কুন্দের প্রকাশ কুণ্ঠাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাহার পর কুন্দের গৃহত্যাগে নগেন্দ্রনাথের সমস্ত বাধা সংযম ছিন্ন হইয়াছে—তিনি সূর্যমুখীর নিকট নিতান্ত রূঢ়ভাবে কুন্দের প্রতি নিজ অনিবার্য প্রেমের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সূর্যমুখী নিজে উদ্যোগী হইয়া

উভয়ের মধ্যে বিবাহ দিয়া নিজে গৃহত্যাগী হইয়াছে। বিষবৃক্ষের প্রথম ফল ফলিয়াছে।

সূর্যমুখীর গৃহত্যাগে নগেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ হইয়াছে—কুন্দের প্রতি সীমাহীন, অগাধ ভালোবাসা এক মুহূর্তেই শুকাইয়া গিয়াছে। কুন্দের প্রতি আকর্ষণ একটা বিরাট ভ্রান্তি, অধম রূপজ মোহরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। হতভাগিনী কুন্দ সমস্ত আদর-সোহাগ হইতে বঞ্চিত হইয়া অনাদর, উপেক্ষা ও ভর্ৎসনার পাত্র হইয়াছে। সূর্যমুখীর প্রতি প্রেম অনুতাপের অগ্নিশিখার ভিতর দিয়া দ্বিগুণ উজ্জ্বলভাবে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'স্তিমিত প্রদীপে' নামক অধ্যায়ে লেখক নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পূর্বপ্রণয়ের যে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়াছেন, কয়েকটি আখ্যানের মধ্য দিয়া ইহার গাঢ়তা ও সর্বাঙ্গীণ একত্ব যেরূপ কবিত্বপূর্ণ অনুভূতির সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহা বাংলা উপন্যাসে অতুলনীয়। এই পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের অপ্রত্যাশিত মিলন ঘটিয়াছে। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের মনোভাবের আকস্মিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু এই অতর্কিত প্রতিক্রিয়ার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই।

এই মিলনানন্দ ব্যাহত হইয়াছে কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যায়। ইহা বিষবৃক্ষের অপরিহার্য ফল। অসংযত কামনার বহ্নিতে কাহাকেও না কাহাকেও আত্মবিসর্জন করিতে হইবে—না হইলে ন্যায়নীতির মর্যাদা রক্ষা হয় না। হৃদয়সমুদ্রমন্থনে উত্থিত হলাহল কেহ পান না করিলে এই গভীর আলোড়নের কোনো সার্থকতা

থাকে না। অবশ্য এই আত্মহত্যার প্রেরণা আসিয়াছে কুন্দের নিজ কোমল, প্রকাশবিমুখ অন্তরের অন্তস্তল হইতে নহে, প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে। হীরার ঈর্ষাফেনিল হৃদয়-বিক্ষোভই এই বিষের প্রকৃত উৎস। এইরূপে অন্তর ও বাহিরের সহযোগিতাতেই আমাদের জীবনে বিপ্লব উপস্থিত হয়। অন্তর-কন্দরে প্রধূমিত অগ্নি বাহিরের ফুৎকারে প্রোজ্জ্বল হয়। কুন্দের হৃদয়ের নিগূঢ় প্রবৃত্তি অর্ধস্ফুট আত্মহত্যার অভিপ্রায়, হীরার সাংঘাতিক প্ররোচনার বহির্ঘটনায় রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর উন্নত ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত হীরার কলুষিত, দুর্দমনীয় হৃদয়াবেগকে এক সূত্রে গাঁথিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব কলাকৌশল দেখাইয়াছেন। এই উপায়ে তিনি হীরাকে কেবল অপরের প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়মাত্র না করিয়া তাহার স্বকীয়তা ফুটাইয়াছেন। হীরা উপন্যাসের কেবল গৌণ চরিত্র মাত্র নহে, সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর অধীনস্থ উপগ্রহ মাত্র নহে—সে নিজের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিতে, নিজ স্বতন্ত্র কক্ষানুবর্তনে ও অপরের উপর ভয়াবহ প্রভাবে ধূমকেতুর সহিত তুলনীয়। প্রেমের অধিকারের দাবিতে সে দাসী হইয়াও প্রভুপত্নীর সহিত সমকক্ষতা অর্জন করিয়াছে। সূর্যমুখীর অযুচিত-সৌভাগ্যে সে তাহার বিরুদ্ধে নিগূঢ় অভিমান পোষণ করে। তাহার হৃদয়ে ভাগ্যের বিরুদ্ধে অভিমান ও অনায়ত্ত প্রেমের ক্ষোভ যে আগুন জ্বালিয়াছে, তাহাই সে দিকে দিকে ছড়াইয়াছে—তাহারই স্ফুলিঙ্গে সে সূর্যমুখী ও কুন্দ-নন্দিনীর সুখের ঘর দগ্ধ করিয়াছে। তাহার প্রণয়ভাজন তাহার

হৃদয়ের অর্ঘ্য উপেক্ষা করিয়া কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে কুন্দনন্দিনীকে লাভ করিবার জন্য তাহাকেই দূতীরূপে নিয়োজিত করিতে চাহিয়াছে—ইহাই তাহার মনকে কুন্দের বিরুদ্ধে বিজাতীয় ঈর্ষা ও ক্রোধে পূর্ণ করিয়াছে। সে নিজেরই হৃদয়নিঃসৃত হলাহল কুন্দের ওষ্ঠে তুলিয়া ধরিয়াছে, কুন্দকে আত্মহত্যায় প্রণোদিত করিয়া ও আত্মঘাতী অস্ত্র যোগাইয়া নিজ দারুণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছে। তাহার নিজের শেষ পরিণাম আরও করুণ, আরও মর্মস্পর্শী। তাহার চরম দুর্ভাগ্য যে তাহার ওষ্ঠে বিষ তুলিয়া ধরিবার কেহ ছিল না, তাহার বেদনাময় জীবন কোনো কৃত্রিম উপায়ে সংক্ষিপ্ত হয় নাই। তাহার উন্মাদগ্রস্ত মন এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। দেবেন্দ্র ও কুন্দের বিরুদ্ধে অনির্বাণ ক্রোধ, প্রত্যাখ্যানের দারুণ অপমান জ্বালা, অতৃপ্ত প্রেমপিপাসা, অনুশোচনার তুষানল—সমস্ত মিলিয়া তাহার অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কে এক দারুণ ঝড় তুলিয়াছে। এবং এই তুমুল কোলাহলের মধ্যে পূর্বসুখস্মৃতি রহিয়া রহিয়া এক অপূর্ব গীতিঝংকারে তাহার তৃপ্তিহীন প্রেমবুভুক্ষার হাহাকার ধ্বনিত করিয়াছে।

অনিন্দনীয়চরিত্র ও পত্নীবৎসল নগেন্দ্রনাথের পদস্খলন কেন হইল লেখক ইহার কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন নাই। নগেন্দ্রের চরিত্রে কোনো দুর্বলতার বীজ নিহিত না থাকিলে কুন্দের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ এরূপ দুর্দমনীয় হইত না। দয়া কি করিয়া প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই পরিণতির ইতিহাস অকথিত

রহিয়া গিয়াছে। এই অধ্যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে; বর্তমান উপন্যাসে পাঠকের অনুমান শক্তি ও সাধারণ মানবচরিত্রজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই লেখক নিজ দায়িত্ব অসম্পন্ন রাখিয়াছেন। অনাথা বালিকাকে গৃহে আশ্রয় দিলে কি করিয়া বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয় তাহা ঠিক পরিষ্কার হয় নাই। সুতরাং সমবেদনার পিছনে যে প্রথম হইতেই রূপ-মোহের আভাস ছিল ইহা ফুটাইয়া না তুলিলে গ্রন্থের নামকরণ সার্থক হয় না। বোধ হয় হরদেব ঘোষালকে লিখিত পত্রে নগেন্দ্রনাথ কুন্দের যে সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার ছদ্মবেশে মোহ বিহ্বলতা নিজ অস্তিত্ব প্রকট করিয়াছে। ইহাই যদি উপন্যাসের সমস্যার প্রকৃত ভিত্তি হয়, তবে ইহার সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রয়োজন ছিল। নগেন্দ্রনাথের আচরণ সম্বন্ধে লেখক যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা ঠিক সন্তোষজনক নহে। চিত্তসংযমের অভাব যে নগেন্দ্রের পদস্খলনের কারণ, দুঃখের অভিজ্ঞতা ভিন্ন যে চিত্তশুদ্ধি হয় না—ইহা অতি ব্যাপক ও সাধারণ সত্য, এবং সম্ভবতঃ কতকটা অনুচিত নীতিপ্রভাবের সূচক। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এই সাধারণ সত্যের প্রয়োগ ব্যক্তিগত জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত হওয়া প্রয়োজন। নগেন্দ্রনাথের পূর্বজীবনে কোনো অসংযমের অঙ্কুর না দেখাইলে তাঁহার পরবর্তী জীবনে ইহার অতর্কিত প্রকাশ ঠিক আমাদের বোধগম্য হয় না। সূর্যমুখীর প্রতি তাঁহার গভীর একনিষ্ঠ প্রেম এত সহজে কি করিয়া বিচলিত হইল তাহার কোনো সদুত্তর মিলে না।

সূর্যমুখী তাহার একনিষ্ঠ ও ত্রুটিহীন পতিপ্রেম সত্ত্বেও নগেন্দ্রের সহিত বিচ্ছেদের জন্য কতকাংশে দায়ী। তাহার চরিত্রে সাধ্বী পত্নীর ন্যায়সংগত গর্ব তাহার কোমলতা ও ভাবোচ্ছ্বাসের দিকটা অনেকটা অভিভূত করিয়াছিল। সেই জন্য স্বামীর চিত্তবিমুখতাকে জয় করিবার জন্য সে ভ্রমরের মত কোনো ভাববিলাসমূলক আবেদন করে নাই, বিনা প্রতিবাদে, নিজের বেদনা সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া স্বামীর ইচ্ছানুবর্তন করিয়াছে। তাহার সন্তানহীনতাও স্বামীর উপর তাহার অধিকারকে অনেকটা দুর্বল করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। সূর্যমুখীর অভিমানমূলক নিষ্ক্রিয়তা, নীতির দিক দিয়া অনিন্দনীয় হইলেও, ঘটনানিয়ন্ত্রণের দিক দিয়া ভুল চাল।

কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রের মধুর, কপট মান-অভিমানে সুস্বাদু, দাম্পত্যসম্পর্ক প্রেমের অশেষবিধ বৈচিত্র্যের আর একটি নূতন উদাহরণ। এখানে শিশু সতীশচন্দ্র, পিতামাতার স্নেহ ও কৌতুক-স্পৃহা উদ্রিক্ত করিয়া তাহাদের পারস্পরিক আকর্ষণকে আরও নিবিড় ও অচ্ছেদ্য করিয়াছে। সূর্যমুখী ভ্রমরের নিঃসন্তান অবস্থা পুনর্মিলনের স্বাভাবিক সূত্রের অভাবের জন্যই তাহাদের দাম্পত্যবিচ্ছেদের তীব্রতা বাড়াইয়াছে।

সরস ও জীবন্ত বাস্তব বর্ণনাতেও বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষে' প্রশংসনীয় ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রা, স্নানের ঘাটে মেয়েদের কৌতুকপূর্ণ আলাপ-আচরণ, নৈদাঘ ঝটিকাবৃষ্টি, জমিদার-বাড়ির অন্তঃপুরের সাধারণ জীবনযাত্রা প্রভৃতির বর্ণনায় যে সরস

পর্যবেক্ষণশক্তি ও বাস্তব রস উপভোগের পরিচয় পাই, তাহা পরবর্তী উপন্যাস-সাহিত্যে আদর্শবাদের ও মন্তব্য বিশ্লেষণের অতি-প্রাদুর্ভাবের জন্য ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। ভাবাবেগ-বর্ণনাতেও বঙ্কিম যে সংযম ও মিতভাষিতা দেখাইয়াছেন তাহা অশ্রুপ্রবণ, ভাবাতিরেকবিলাসী বাঙালীর পক্ষে বিস্ময়কর। শোকের দৃশ্যে অশ্রুপ্রাচুর্যের পরিবর্তে সংযত, গম্ভীর, স্বল্পভাষী বিষাদই ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ভাষাপ্রয়োগে কারুণ্য রসের মর্মভেদী তীব্রতা কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা বঙ্কিমের অক্ষমতার পরিচয় নহে, ভ্রান্ত আদর্শ অনুসরণের ফল। এক 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে বাদ দিলে, সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'বিষবৃক্ষের' অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠত্ব। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ কলাকৌশলের নিদর্শন। পূর্বরচিত উপন্যাসের ফাঁক-ত্রুটি এখানে সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা হইয়াছে। গোবিন্দলালের রোহিণীর প্রতি মনোভাব কিরূপ সূক্ষ্ম পরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করিয়া দয়া ও সমবেদনা হইতে দুর্দমনীয় রূপমোহে পরিণতি লাভ করিয়াছে, অন্তরের প্রবৃত্তি ও বাহিরের প্রভাব কি করিয়া এই পরিণতি-সাধনে সহযোগিতা করিয়াছে তাহার ঘটনামূলক বিবৃতি ও উদ্দেশ্য-বিশ্লেষণ অনবদ্য হইয়াছে। একান্নবর্তী ও সমাজ-সংশ্লিষ্ট বাঙালী-জীবনে অন্তর-সমস্যা পরিজন ও প্রতিবেশের প্রভাবে জটিলতর হয়। 'বিষবৃক্ষে' এই প্রতিবেশ-প্রভাব অযথা সংকুচিত হইয়াছিল—নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সমস্যায় এক হীরা ছাড়া বাহিরের কোনো শক্তি হস্তক্ষেপ করে নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে', বহিঃপ্রভাব উপযুক্ত

মর্যাদা লাভ করিয়া সমস্যার প্রকৃতিকে অধিকতর বাস্তবানুগামী করিয়াছে।

উইলের সর্ত বদলানো বাহিরের ব্যাপার হইলেও প্রত্যেকবারই উপন্যাসের চরিত্রদের ভাগ্যপরিবর্তনের পালা সূচিত করিয়াছে। এই ব্যাপারে হরলাল রোহিণীর সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তাহার সুপ্ত যৌবন ক্ষুধাকে জাগরিত করিয়াছে—হরলালের দ্বারা প্রত্যাখ্যান তাহার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রবৃত্তিকে আরও দুর্দমনীয় করিয়াছে। এই উত্তেজিত অবস্থায় গোবিন্দলালের বিশুদ্ধ সহানুভূতি রোহিণীর লালসাগ্নিতেও ইন্ধন যোগাইয়াছে। সে গোবিন্দলালের সপক্ষে উইল বদলাইতে গিয়াও ধরা পড়িয়া গোবিন্দলালের প্রবলতর সমবেদনা আকর্ষণ করিয়াছে ও মোহের জালে আরও জড়াইয়া পড়িয়াছে। এমন কি সে গোবিন্দলালের প্রতি নিজ অনিবার্য প্রণয়পিপাসা স্বীকার করিয়াছে। গোবিন্দলাল এখনও অবিচলিত—এই প্রণয়-নিবেদনের ফলে তাহার হৃদয়ে জাগিয়াছে করুণার নির্মল উচ্ছ্বাস। ভ্রমরের ব্যঙ্গোক্তিতে মর্মপীড়িতা রোহিণী বারুণী নিমজ্জন হইতে গোবিন্দলাল কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিকট নৈরাশ্যক্লিষ্ট হৃদয়ে নিজ দুর্ভাগ্যের উল্লেখ করিয়াছে। এইবার গোবিন্দলালের সমবেদনার উপর প্রণয়োন্মেষের প্রথম রক্তিমরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে। রোহিণী জানিয়াছে যে গোবিন্দলাল তাহার রূপমুগ্ধ। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুশয্যায় তৃতীয়বার উইল পরিবর্তন গোবিন্দলালের মনে ভ্রমরের বিরুদ্ধে অভিমান জাগাইয়া তাহাদের পুনর্মিলনের পথ আরও দুর্গম করিয়াছে।

গোবিন্দলাল যখন রোহিণীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে প্রাণপণ আত্মদমনচেষ্টা করিতেছে, তখন বাহিরের প্রভাব তাহার দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করিয়াছে। রোহিণীর নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্য প্রণয়ঘোষণা প্রতিবেশীর কুৎসারটনার প্রবৃত্তিকে অবারিত অবসর দিয়াছে। এই অন্যায় কলঙ্কারোপ গোবিন্দলালকে প্রলোভনের দিকে আরও অগ্রসর করিয়াছে। তাহার অদূরদর্শী মাতার বধূর প্রতি বিরাগ ও ভ্রমরের অসময়োচিত অভিমান ও পিত্রালয়ে গমন গোবিন্দলালের সংযমের শেষ গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া তাহার অধঃপতনকে সম্পূর্ণ করিয়াছে। এইরূপে অন্তর-বাহিরের সহযোগিতায় উপন্যাসের সমস্যার চরম পরিণতি ঘটিয়াছে। নগেন্দ্রনাথের পদস্খলনের ক্ষেত্রে যে অংশটুকু অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, গোবিন্দলালের ব্যাপারে তাহার উপর স্বচ্ছ উজ্জ্বল, আলোক নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

এই বিষাদময় পরিণতিতে ভ্রমরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সূর্যমুখীর নিরপেক্ষতা অপেক্ষা ভ্রমরের ভুলপথে চলা আরও বাস্তবানুগামী। ভ্রমর-গোবিন্দলালের সম্পর্কে কতকটা কৈশোরোচিত ভাবোচ্ছ্বাস, ছেলেখেলার অবাস্তবতা ও অনভিজ্ঞতার আতিশয্য ছিল —এই ভালোবাসা কোনো কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই, নিবিড় রসঘন একাত্মতা লাভ করে নাই। গোবিন্দলালের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা, প্রথম প্রণয়ের যাদুমন্ত্রে নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেও, অন্তরের গভীর স্তরে অনুকূল অবসরের প্রতীক্ষায় প্রচ্ছন্ন ছিল। ভ্রমরের সহিত ছেলেমানুষী প্রণয়ের খেলা খেলিয়া তাহার অন্তর পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায় নাই। সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথের পরীক্ষিত, অভিজ্ঞতার ঘাত-

প্রতিঘাতে দৃঢ়ীভূত, সুদীর্ঘ পরিচয়ে সমপ্রাণতার পর্যায়ে উন্নীত, প্রেমের আকস্মিক তিরোভাব স্বাভাবিক পরিণতি অপেক্ষা ইন্দ্রজাল-প্রভাবের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভ্রমর-গোবিন্দলালের কাঁচা, কৈশোর-প্রেমের ভাঙন কোনোরূপ অবিশ্বাসের উদ্রেক করে না। ভ্রমরের আচরণে অসংগত খেয়াল ও অভিমান, দুষ্কৃতকারী স্বামীর প্রতি তাহার ক্ষমাহীন বিমুখতা সূর্যমুখীর সহিত তুলনায় তাহার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সুন্দর অভিব্যক্তি। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎলাভ, স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া অনন্তপথযাত্রা। রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, আমাদের ভারতীয় সতীত্বের বাস্তব উপাদান ও প্রেরণা—সুতরাং এই বিদায়দৃশ্যে বাস্তবের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। গোবিন্দলালের সন্ন্যাসধর্মগ্রহণ সেইরূপ রোমান্টিক হইলেও ভারতীয় আদর্শে বাস্তব—বিশেষতঃ ইহা উপন্যাসের পরিশিষ্ট বলিয়া উপন্যাসে আলোচিত সমস্যার সহিত নিঃসম্পর্ক।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীর আকস্মিক মৃত্যু সংঘটন বিরুদ্ধ-সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। রোহিণীর বঞ্চিত জীবনের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়া লেখকের নীতিজ্ঞান হঠাৎ জাগ্রত হইয়াছে ও পাছে এই অসামাজিক, কলঙ্কিত প্রণয় পাঠকের মনে মোহ বিস্তার করে সেই জন্য রোহিণীকে অবিশ্বাসিনী করিয়া পিস্তলের গুলিতে তাহাকে অপসারিত করা হইয়াছে। এই আপত্তির মূল সূত্র দুইটি—প্রথমতঃ, রোহিণীর চরিত্র-পরিকল্পনায় অতর্কিত পরিবর্তন; দ্বিতীয়ত, তাহার অপঘাতমৃত্যু ঘটাইয়া তাহার সমস্যার অনুচিতরূপ

সুলভ সমাধান। প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে লেখক রোহিণীচরিত্রপরিকল্পনায় বরাবর সংগতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। তাহার অকালবৈধব্য-বেদনার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল, কিন্তু এই সহানুভূতি তাহার ইতর, স্বার্থপর লোলুপতায় ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে ও ইহা কখনও কলঙ্কিত প্রণয়ের সমর্থন পর্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। প্রণয়লালসা চরিতার্থতার জন্য চুরি করা, গোবিন্দলালের নিকট অসংকোচ প্রণয়-নিবেদন, ভ্রমরকে মনঃপীড়া দিবার জন্য গায়ে পড়িয়া নিজ মিথ্যাকলঙ্ক-ঘোষণা, বিন্দুমাত্র সংকোচ বা অনুতাপ না দেখাইয়া গোবিন্দলালের সহিত নিরুদ্দেশ যাত্রা, প্রসাদপুরে তাহার নিরবচ্ছিন্ন ভোগবিলাসের মধ্যে জীবন যাপন—এ সমস্তই তাহার অন্তর্নিহিত স্থূল ইতরতার নিদর্শন। উইল চুরি ব্যাপারে গোবিন্দলালের প্রতি অনুষ্ঠিত অবিচারের জন্য অনুতাপ ও অসহ্য হৃদয়বেদনার জন্য আত্মহত্যার সংকল্প—এই দুইটি ব্যাপারে তাহার উচ্চতর প্রবৃত্তির ক্ষণিক বিকাশ দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের মূলে আছে অবিমিশ্র উৎকট লালসা। বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে তাহাকে পিশাচী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সুতরাং রোহিণী সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার হঠাৎ কোনো পরিবর্তন হয় নাই ইহা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় আপত্তি রোহিণীর অতর্কিত মৃত্যুর বৈধতা-সম্বন্ধীয়। লেখক কি রহিণীর ক্রমবর্ধমান চিত্তাকর্ষকতার প্রতিষেধের জন্যই তাহার বন্দুকের গুলির আঘাতে মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, না, ইহার কলাকৌশলসম্মত, ন্যায্যতর কোনো হেতু আছে? বঙ্কিমচন্দ্রের পাপ-

দৃশ্যের বিস্তৃত বর্ণনার প্রতি যে বদ্ধমূল বিরাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই পাঠকের এরূপ ভ্রান্ত ধারণার জন্য দায়ী তাহা স্বীকার্য। এই জন্যই পাঠক রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের ক্রমশ ক্ষয়শীল আকর্ষণের যে নাতিস্পষ্ট আভাস দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক ধরিতে পারে না। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলেই কিন্তু মোহভঙ্গের অঙ্কুর ধরা পড়ে। প্রসাদপুরের ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদে এই ক্ষয়িষ্ণু, মরণোন্মুখ প্রেমলীলার পটভূমিকা-বিন্যাস চমৎকার কলাকৌশলের নিদর্শন। গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া ভদ্র, সংযত, গার্হস্থ্য জীবন যাপন করে নাই, তাহাকে গণিকা-সুলভ আবেষ্টনে, গীতবাদ্যের কৃত্রিম উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ায় রাখিয়াছে। ইহাতেই তাহাদের সম্পর্কের কৃত্রিমতা ও অস্থায়িত্বের সুরটি ধরা পড়িয়াছে। রোহিণীর অবিশ্বাসিতা গোবিন্দলালের অন্তরে পুঞ্জীভূত মোহভঙ্গ ও বিতৃষ্ণার দাহ্য পদার্থে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে—বন্দুকের গুলি ইহারই অনিবার্য বিস্ফোরণ। রোহিণীর চরিত্রের পাপপ্রবণতা ও ভোগলিপ্সার বিস্তৃত চিত্রের অভাবেই তাহার অন্যাসক্তি এত দৃষ্টিকটুরূপে আকস্মিক বলিয়া ঠেকে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থমধ্যে রোহিণী ও ভ্রমরের ভালোবাসার বিভিন্ন প্রকৃতির যে চমৎকার সাংকেতিকতাপূর্ণ বিশ্লেষণ দিয়াছেন, তাহাতেই পরিণতির সম্পূর্ণ ইতিহাস আভাসে ব্যক্ত হইয়াছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিম-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান সামাজিক উপন্যাস। তাঁহার রোমান্সপ্রবণতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য যদি তাঁহার ঔপন্যাসিক শক্তিমত্তার প্রতি আমাদের সাময়িক সংশয় জাগে, তবে 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের

উইল' ও রস-রচনাবিভাগে 'কমলাকান্তের দপ্তর' সেই সন্দেহ নিরসনের পক্ষে যথেষ্ট।

৫

রমেশচন্দ্রের প্রথম রচনা 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৩) কাঁচা হাতের নিদর্শন। ইহার ঐতিহাসিক অংশ টোডরমল কর্তৃক বাংলা দেশে পাঠানবিদ্রোহ দমন—শুষ্ক ও নীরস। টোডরমল নিজে খুব সজীব নহেন। ইচ্ছাপুরে তাঁহার আমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে হিন্দুরাজার সভাড়ম্বর ও অভ্যর্থনাবিধির চিত্রে যুগের বিশিষ্ট পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অনৈতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে কাহারও স্বাভাবিক স্ফূর্তি হয় নাই। ইন্দ্রনাথ-সরলা ও উপেন্দ্রনাথ-কমলার প্রেমকাহিনী জীবনহীন ও বিশেষত্ববর্জিত। গ্রন্থের villain শকুনিও অস্পষ্ট, প্রথানুবর্তিতার নিদর্শন। গ্রন্থের ছায়াময় অস্পষ্টতার মধ্যে মহাশ্বেতার জিঘাংসা ও সরলা-অমলার সখিত্বই কতকটা বাস্তবগুণোপেত হইয়াছে। ইন্দ্রনাথের প্রতি বিমলার প্রেম 'দুর্গেশনন্দিনী'র অনুরূপ অবস্থার অনুকরণ মাত্র। কেবল এক যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণনায় লেখকের স্বাভাবিক নৈপুণ্য ও আন্তরিক আবেগ অনুভূত হয়। প্রকৃতির শান্ত গম্ভীর সৌন্দর্যানুভূতিতেও লেখকের প্রশংসনীয় ক্ষমতার পরিচয় মিলে।

'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৬) 'বঙ্গবিজেতা'র সহিত তুলনায় আশ্চর্য উন্নতির লক্ষণান্বিত। ইহা ঐতিহাসিক আবেষ্টনে সন্নিবিষ্ট পারিবারিক উপন্যাস। ইহাতে ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধ খুব নিবিড়। গৃহত্যাগী নরেন্দ্র শাহ্‌জাহানের রাজত্বশেষে মোগল সম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্যে যে তুমুল গৃহবিবাদ বাধিয়াছিল

তাহার সহিত জড়িত হইয়া পড়ে। উপন্যাসের ঐতিহাসিক চিত্রগুলি সুলিখিত ও সেই যুগের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিচ্ছবি। রাজমহলে সুজার দরবারের চিত্রে আমরা তৎকালীন মোগল সম্রাটদের যথেচ্ছাচারিতা ও তোষামোদপ্রিয়তা, আমলাতন্ত্রের চক্রান্তজালে জমিদারশ্রেণীর অতর্কিত ভাগ্যপরিবর্তনের সুস্পষ্ট উপভোগ্য বিবরণ পাই। রাজা যশোবন্ত সিংহের মেওয়ারী মারোয়াড়ী সৈন্যদলের হাস্যপরিহাস ও কৃত্রিম কলহের উল্লেখে বিভিন্ন রাজপুতগোষ্ঠীর মধ্যে যে রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল তাহার চমৎকার ইঙ্গিত মিলে। বারাণসী ও দিল্লী রাজধানীর যে জনবহুল, সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ চিত্র ও মোগল রাজ-অন্তঃপুরের যে ভয়াবহ ব্যঞ্জনাবেষ্টিত অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা পাই, তাহা 'রাজসিংহে'র বর্ণনার সহিত তুলনীয়। মোগল রাজপ্রাসাদের চমকপ্রদ আড়ম্বর নরেন্দ্রের বিস্ময় বিমূঢ় হতবুদ্ধি মনোভাবের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়া যেন ঐন্দ্রজালিক মায়ার সমপর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। নরেন্দ্রের প্রতি জেলেখাঁর করুণ ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীটি আলো-আঁধার-মেশা অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া নীত হইয়া সাংকেতিকতার রহস্যে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

পারিবারিক জীবনের চিত্র ইতিহাস অপেক্ষা আরও সূক্ষ্মতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। নরেন্দ্রের অসহিষ্ণু অভিমানপ্রবণ প্রকৃতির যে ইঙ্গিত আমরা তাহার শৈশবক্রীড়ার মধ্যে পাই, তাহা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে আরও উদ্দাম অসংযত তীব্রতার সহিত পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার ধৈর্যের অভাব ও উদ্ধত প্রকৃতিই হেমলতার প্রতি তাহার তীব্র জ্বালাময় প্রণয়কে ব্যর্থ করিয়াছে। নরেন্দ্র ও হেমের মধ্যে যে দুইটি

প্রেমের দৃশ্য অভিনীত হইয়াছে, তাহাতে প্রেমের অগ্নিগর্ভ, অভিমান-ক্ষুব্ধ অভিব্যক্তি ভাবের আন্তরিকতা ও ভাষার সরল বাহুল্যবর্জিত উপযোগিতার দিক দিয়া বাংলা উপন্যাসে অতুলনীয়। প্রথম দৃশ্যে নরেন্দ্রের ওজস্বী নৈরাশ্যক্লিষ্ট প্রেম নিবেদন যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দাহ ও দীপ্তি ছড়াইয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রত্যাখ্যানের শান্ত করুণ বিষাদ আমাদিগকে গভীরভাবে অভিভূত করে। এই দৃশ্যে হেমলতার কথা-গুলির মধ্যে অলংকার বাহুল্য ও নীতিকথার অযথা প্রভাব লক্ষিত হইলেও মোটের উপর ভাবের গভীর আন্তরিকতা ব্যাহত হয় নাই। যমুনাজলে বিসর্জিত মাধবীকঙ্কণের শুষ্ক মালাটি নরেন্দ্র-হেমলতার ব্যর্থ অথচ হৃদয়ের গভীরস্তরস্পর্শী প্রণয়ের সার্থক রূপক-ব্যাঞ্জনায় পরিণত হইয়াছে।

নরেন্দ্র ও শ্রীশের প্রতি হেমলতার ব্যবহারের সূক্ষ্ম পার্থক্য লেখক চমৎকারভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশের প্রতি হেমের ভক্তি-শ্রদ্ধা-আনুগত্য সমর্পিত হইয়াছে; নরেন্দ্রের প্রতি তাহার প্রতিরুদ্ধ গভীর অনুরাগ,তাহার যৌবনশ্রী ও মাধুর্যকে শুষ্ক করিয়াছে। একমাত্র শৈবলিনীই তাহার এই যত্ননিরুদ্ধ অন্তররহস্যটি ধরিতে পারিয়াছে। হেমলতার দাম্পত্য জীবনের ছবিটি সন্ধ্যার ম্লান ধূসর ছায়ার ন্যায় উচ্ছ্বাসহীন ও বর্ণ-বিরল—ইহাই তাহার নীরব অন্তর্দ্বন্দ্বের একমাত্র বহিঃপ্রকাশ। নরেন্দ্র-হেমলতার ভালোবাসার কাহিনী, সরল মর্ম্মস্পর্শী আন্তরিকতায়, তীক্ষ্ণ, অতিরঞ্জনহীন বাস্তবতায় প্রতাপ-শৈবলিনীর আদর্শলোকের বর্ণে অনুরঞ্জিত, কল্পনার ঐশ্বর্যে গরীয়ান প্রেমচিত্র অপেক্ষা আমাদের চিত্তকে আরও গভীরভাবে স্পর্শ করে।

রমেশচন্দ্রের পরবর্তী দুইখানি উপন্যাস, 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' সম্পূর্ণভাবেই ঐতিহাসিক। ইহাদের বর্ণিত বিষয়ে ইতিহাসের সংস্কার ও উদ্দীপনা যথেষ্ট আছে,কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের সহিত ইতিহাসের বিশেষ কোনো সংযোগ নাই। এই উপন্যাস দুইখানিতে প্রেমের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে,তাহা ইতিহাস-প্রাধান্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া অনেকটা প্রাণহীন হইয়াছে। 'জীবন-প্রভাতে' রঘুনাথ ও সরযূবালার প্রেম বৈশিষ্ট্যবর্জিত। 'জীবন-সন্ধ্যায়' তেজসিংহ-পুষ্পকুমারীর প্রেম, ভীল-বালার ঈর্ষা ও বিরোধিতার জন্য, ও অভিমান ও সন্দেহের স্ফুরণ হেতু কতকটা অভিনবত্ব অর্জন করিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর ইতিহাস-মহাবৃক্ষের ছায়ায় আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের সুকুমার বিকাশটি তেমন স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে নাই। রঘুনাথ আদর্শ প্রেমিক, কিন্তু ব্যক্তিত্ব-হীন; তেজসিংহের বংশমর্যাদা পুনরুদ্ধারে দৃঢ়সংকল্প ও দুর্জয়সিংহের সহিত তাহার বংশানুক্রমিক তীব্র প্রতিযোগিতা তাহার ব্যক্তিত্বকে অধিকতর বিকশিত করিয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে চরিত্রবিশ্লেষণের সংকীর্ণ অবসর সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তবে বিশ্লেষণের অভাব ঘটনাবৈচিত্র্য, বীরত্বের বিস্ময়কর বিকাশ, জীবনের উচ্চতম বৃত্তিসমূহের অবাধ স্ফূরণ প্রভৃতির দ্বারা অনেকটা পূর্ণ হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের উত্থান ও রাজপুতের পতন ভারত-ইতিহাসের দুই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই দুই যুগের জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গের ছবি রমেশচন্দ্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ছদ্মবেশী শিবাজীর মোগল শিবিরে গমন, যশোবন্তসিংহের প্রতি তাঁহার গৈরিক ধাতুস্রাবের ন্যায় জ্বালাময় উদ্দীপনাপূর্ণ আবেদন,

তাঁহার দুঃসাহসিক নিশীথ-অভিযান, রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণের অদ্ভুত শৌর্য ও কৌশল, দিল্লীতে তাঁহার বিপদ ও আরংজীবের চক্ষে ধূলি প্রদান-পূর্বক সেখান হইতে পলায়ন, চন্দ্ররাওএর বিচারকালে তাঁহার ক্ষমাহীন ক্রোধের বজ্রকঠোর অভিব্যক্তি ; আহেরিয়ার মৃগয়া, রাঠোর-চন্দাওতের বংশপরম্পরাগত বৈরিতা,দেশরক্ষার জন্য রাজপুতবীরের সর্বস্বপণ প্রচেষ্টা, রাজপুতরমণীর চিতানলে আত্মবিসর্জন—এই সমস্ত দৃশ্যের বর্ণনা যেন অগ্নিদীপ্তিতে ফুটিয়া উঠিয়া পাঠকের মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। 'জীবন-প্রভাতে' শিবাজী ও আরংজীবের চরিত্র ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রণের উচ্চতম আদর্শের উপযুক্ত হইয়াছে। শিবাজী কেবলমাত্র আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক নহেন, তাঁহার রাজনীতিকুশলতা, চাণক্যনীতি-প্রয়োগে অসাধারণ নৈপুণ্য, লোকচরিত্রে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা, দক্ষতর চাতুর্যের দ্বারা আরংজীবের শঠনীতির প্রতিরোধ—এই সমস্তই তাঁহাকে অতিমাত্রায় বাস্তবগুণসমৃদ্ধ করিয়াছে। শিবাজীর চরিত্রে বিশ্বাসঘাতকতার যে কলঙ্ক আরোপিত হয়, তাহা আমাদের দেশপ্রেমের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছনীয় হইলেও, কলাবিদের নিকট বিশেষ আদরণীয় বৈশিষ্ট্য—কেননা ইহা শিবাজীতে দোষেগুণে সম্পূর্ণ রক্তমাংসের মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। আরংজীবের চরিত্রেও তাঁহার কুটিল, সন্দেহদিগ্ধ, অথচ বহিঃপ্রকাশবিমুখ মনোবৃত্তি চমৎকার ফুটিয়াছে।

শিবাজী ও আরংজীবের মত নিপুণভাবে চিত্রিত কোনো চরিত্র 'জীবন-সন্ধ্যা'য় নাই। সেখানে প্রতাপসিংহ, তেজসিংহ প্রভৃতি স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত পরিচয় তাঁহাদের ঐতিহাসিক গৌরবের অন্তরালে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া 'জীবন-সন্ধ্যা'র শ্রেষ্ঠত্ব

স্বীকার্য।' স্বাধীনতাসংগ্রামের দেশব্যাপী প্রবল প্রেরণা ও আসন্ন বিপদের করাল ছায়াপাত উপন্যাস-বর্ণিত আবহাওয়ার মধ্যে এক গভীর ভাবগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহাই 'জীবন-সন্ধ্যা'র চরম উৎকর্ষ। রমেশচন্দ্র যুগের ব্যাপক, অন্তরঙ্গ পরিচয়টি গভীরভাবে, গীতিকাব্যোচিত উন্মাদনার সহিত অনুভব করিয়াছেন—এমন কি নূতন চারণ-সংগীত রচনা করিয়া যুগের অন্তরতম আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি কাব্যোচ্ছ্বাসময় অভিব্যক্তি দিয়াছেন। চিত্তবিশ্লেষণের আপেক্ষিক অপ্রাচুর্য ও পারিবারিক জীবন-চিত্রণের রিক্ততা সত্ত্বেও এই দুইখানি উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শস্থানীয়।

রমেশচন্দ্রের দুইখানি সামাজিক উপন্যাস, 'সংসার' ও 'সমাজ', তাঁহার শক্তির আর-একটা নূতন অপ্রত্যাশিত দিক উদ্ঘাটিত করে। এই দুইটি উপন্যাসে তিনি ইতিহাসের ঘটনাবৈচিত্র্য ও উদ্দাম কোলাহল হইতে বহুদূরে সরিয়া আসিয়া শান্ত পল্লীজীবনের যে সুন্দর, সরস, সহানুভূতি-স্নিগ্ধ চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বাংলা উপন্যাসে সুলভ নহে। এই পল্লীজীবনের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ঘাতপ্রতিঘাত, ছোটখাট সুখদুঃখ, আশা-অভিলাষের মৃদু আন্দোলন লেখক যেরূপ অনাড়ম্বর অথচ প্রকৃত উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলের সহিত ফুটাইয়াছেন তাহাতে তিনি জেন অস্টেনের সহিত তুলনীয়। সরল, গ্রাম্য নরনারীর জীবনেতিহাস-বিবৃতিতে তিনি অতিরিক্ত বিশ্লেষণ বা পরিমিতিহীন মন্তব্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তিনি জীবনের যে সমস্ত প্রাথমিক ভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে খুব জটিল বিশ্লেষণের অবকাশ নাই। 'সংসারে' শরৎ ও সুধার প্রণয়োন্মেষ ও বাহিরের

প্রতিকূলতায় ইহার অন্তঃরুদ্ধ ব্যাকুলতার চিত্রে নগেন্দ্রনাথ বা গোবিন্দ-লালের গুরুতর অন্তর্বিপ্লবের কোনো ছায়াপাত হয় নাই। রমেশচন্দ্র জীবনের সমস্যাসংকুল গভীরতায় অবতরণ করেন নাই, ইহার শান্ত প্রবাহেরই অনুবর্তন করিয়াছেন।

এই অপেক্ষাকৃত অগভীর স্তরে তিনি জীবনের যে সুন্দর, স্বচ্ছন্দ বিকাশগুলি চিত্রিত করিয়াছেন তাহা বাংলা উপন্যাসে অতুলনীয়। বিষয়-বুদ্ধিশালী, অথচ কর্তব্য ও স্নেহের দাবির প্রতি মৌখিক আনুগত্য জানাইতে তৎপর, তারিণীবাবুর চরিত্রটি অল্প পরিসরের মধ্যে চমৎকার ফুটিয়াছে। দুই-একটি রেখায় বিন্দু, কালী ও উমার মধ্যে চরিত্রগত ও অবস্থাগত প্রভেদটি, ও উমার হাস্যোজ্জ্বল, সৌভাগ্যমণ্ডিত জীবনে ভবিষ্যৎ দুঃখের ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি সার্থক ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। এমন কি কালীতারার তিনটি খুড়শাশুড়ীও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যসহ পৃথকভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রতি করুণ অকৃত্রিম সহানুভূতি লেখকের আলোচনা ও মন্তব্যে প্রকটিত হইয়াছে। ধন- ও বংশ-গৌরব অপেক্ষা হৃদয়ের মিলনই যে প্রকৃত সুখের হেতু—এই সত্য, তত্ত্বালোচনার দ্বারা নয়, গভীর রসানুভূতির দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শরৎ ও সুধার মধ্যে প্রীতির সম্পর্কটি এমন সহানুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে যে তাহাদের বিবাহ আমরা কলাসম্মত স্বাভাবিক পরিণতিরূপেই গ্রহণ করি।

কিন্তু এই বিধবাবিবাহের পিছনে যে উগ্র, সংস্কারকোচিত মনো-বৃত্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পরবর্তী উপন্যাস 'সমাজে' বিসদৃশভাবে উদঘাটিত হইয়াছে। এখানে লেখক রমাপ্রসাদ সরস্বতীকে মুখপাত্র করিয়া জাতি-

ভেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন—তত্ত্ববিচার রসানুভূতিকে পিছু হঠাইয়াছে। দেবীপ্রসাদ ও সুশীলার অসবর্ণ বিবাহ সমাজসংস্কারকের অত্যুৎসাহের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে—ইহা শরৎ ও সুধার বিবাহের ন্যায় লেখকের কলাকৌশল ও পাঠকের সহানুভূতির সমর্থন লাভ করে না। তাহা ছাড়া এই অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে জনমতের সোৎসাহ আনুকূল্য কল্পনা করিয়া তিনি বাস্তবভীরুতার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম অংশে 'সংসারে'র চরিত্রগুলির পরবর্তী জীবনের পরিণতি অঙ্কিত হইয়াছে ও পূর্বতন উপন্যাসের সরস বাস্তব চিত্রণের ধারাই অনুসৃত হইয়াছে। তারিণীবাবুর বৃদ্ধবয়সে নূতন বিবাহের ইচ্ছা লইয়া যথেষ্ট কৌতুক ও হাস্যরসের অবতারণা হইয়াছে—তবে উপেক্ষিতা প্রথম স্ত্রীর কাহিনীটি করুণরসে অভিষিক্ত হইয়াছে। তারিণী বাবু ও গোকুলচন্দ্রের বিবাহবিষয়ক কথোপকথনে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলির, বিনয়সৌজন্যের আবরণে ক্ষুরধার কূটবুদ্ধির যে উদাহরণ পাওয়া যায় তাহা বঙ্গসাহিত্যে বিরল। নববধূ গোপবালার উচ্চাভিলাষ ও নির্মম বৈষয়িকতার পূর্বাভাষ তাহার বাল্যজীবনেই সুকৌশলে প্রদত্ত হইয়াছে। ঠাকুরমা ও দাদামহাশয়ের ভিন্নধর্মী দাম্পত্যনীতি ব্যাখ্যার অম্লমধুর রসও উপন্যাসের উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে।

রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস—এই উভয় ক্ষেত্রেই নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসে যুগবৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি, রণোন্মাদনার গভীর অনুভূতি, বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে ভাবগত ঐক্যের সংস্থাপন ও কতকগুলি ঐতিহাসিক চরিত্রের সার্থক পরিকল্পনা প্রধান উৎকর্ষ। সামাজিক উপন্যাসে তাঁহার উৎকর্ষ

সরস, সহানুভূতিপূর্ণ বাস্তব বর্ণনায়। বঙ্কিমের আবেগ, উন্মাদনা বা কল্পনার ঐশ্বর্য তাঁহার নাই। বঙ্কিমের ন্যায় তিনি জীবনের গভীর, সমাধানহীন রহস্য, অতলস্পর্শ বেদনা ও অভ্রভেদী গৌরবের ধারণা ফুটাইতে পারেন না। তথাপি তাঁহার সরল সত্যনিষ্ঠা ও অনাড়ম্বর আন্তরিকতার বলে তিনি কোনো কোনো স্থলে বঙ্কিমকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন—ইহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কৃতিত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা কাব্য ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই বিস্ময়কর সৃষ্টিনৈপুণ্যের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে কাব্য-সুষমার অনবদ্য প্রকাশের সহিত তীক্ষ্ণ অন্তর-বিশ্লেষণের এক আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষিত হয়। তাঁহার উপন্যাসগুলি একদিকে কাব্যসৌন্দর্যসমৃদ্ধ, সুকুমার কবিকল্পনা ও কবিসুলভ সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতিতে মনোজ্ঞ ও রমণীয়। অন্যদিকে তাহারা তীক্ষ্ণ মননশক্তি ও জটিল মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যার আলোচনায় আধুনিক মনের সমস্যা প্রবণতা ও আধুনিক যুগের নিগূঢ় অভিজ্ঞতার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। উপন্যাস-সাহিত্যের বিবর্তনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিশেষ-ভাবে কার্যকরী। তিনিই উপন্যাসকে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসৃত পথ হইতে ফিরাইয়া ইহার অগ্রগতিকে এক সম্পূর্ণ অভিনব পথে চালনা করিয়াছেন। বঙ্কিমের আদর্শপ্রধান রীতির পরিবর্তে তিনি বাংলা উপন্যাসকে আধুনিক যুগোপযোগী বাস্তবতা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার ন্যায় তাঁহার উপন্যাসও সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার

গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশ্বসাহিত্য প্রবাহের সহিত নিজ স্রোত মিশাইয়াছে। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে মানবমন নূতন আবেষ্টনের প্রভাবে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্মুখীন হইতেছে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলার নরনারীর চিত্তে তাহারই উত্তাপ ও জটিলতা সংক্রামিত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসকে প্রথম আর্টের গৌরব ও কলাসৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার মধ্যে বাস্তব আলোচনাপদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া ইহার নূতন পরিণতির পথ নির্দেশ করিয়াছেন ও বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত ইহার সংযোগ ঘটাইয়া ইহার সম্মুখে অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা হইলে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসক্ষেত্রে যুগান্তরকারী পরিবর্তনের প্রবর্তক।

এই পরিবর্তনের দুইটি ধারা বিশেষভাবে লক্ষণীয়; এক, ঐতিহাসিক উপন্যাসের তিরোভাব; দুই, বাস্তবতাধর্মী-উপন্যাসের প্রাদুর্ভাব। বঙ্কিমোত্তর যুগে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিলয়ের কথা তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার কারণ প্রধানতঃ ঔপন্যাসিকদের কল্পনার সঞ্জীবনীশক্তির অভাব। কিন্তু ইহার আরো একটি সূক্ষ্মতর কারণ আছে—তাহা আধুনিক মনের রোমান্স-বিমুখতা। ইতিহাসের বহিঃসংঘাত ও সুলভ উত্তেজনা হইতে আমাদের অতিক্রান্ত যৌবন, প্রৌঢ় চিত্তবৃত্তি আর পূর্বের ন্যায় সরস, চিত্তাকর্ষক কৌতূহল আহরণ করিতে পারে না। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনার আকস্মিকতা, কার্যকারণশৃঙ্খলার দুর্বলতা ও সর্বোপরি অগভীর চিত্তবিশ্লেষণ আমাদের বাস্তবতার অতিজাগ্রত আদর্শবোধকে পীড়িত করে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে মানবস্বাধীনতার

সংকোচ. ও মানবমনের উপর ইহার প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্যের অভাব আমাদের বিরাগকে বর্ধিত করে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের রঙিন কল্পনা অপেক্ষা বহিঃপ্রভাবমুক্ত মানবমনের সত্যস্বরূপের নিখুঁত, বৈজ্ঞানিক পরিচয় আমাদের নিকট অধিকতর প্রার্থনীয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে রোমান্সের উপাদান বর্তমান তাহা ইতিহাসের চমকপ্রদ অসাধারণত্বের সঙ্কিত সম্পূর্ণ সংস্রবহীন—তাহার উৎস তাঁহার কবিমনের ধ্যানতন্ময়তা, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, বহিঃপ্রকৃতির রহস্যঘন, অন্তরঙ্গ স্পর্শ। তাঁহার উপন্যাসসমূহে যে সমস্ত বিচিত্রবর্ণ রোমান্সের ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারা সমস্তই তাঁহার কাব্য-কমণ্ডলু হইতে স্নিগ্ধবারি অভিষেকে লালিত ও বর্ধিত।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কৃতিত্ব—উপন্যাসে সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে বাস্তব রীতির প্রবর্তন। উপন্যাস মাত্রই মূলতঃ বাস্তবধর্মী; কাজেই রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা বুঝিতে হইলে তাঁহার বাস্তবতার অভিনবত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার পূর্বদৃষ্টিবলে বুঝিয়াছিলেন যে বঙ্কিমের অনুসৃত প্রণালীর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তাঁহার আভাস-ইঙ্গিতপ্রবণতা কয়েকটি সুনির্বাচিত তথ্যের দ্বারা সুবৃহৎ পরিবর্তনের ব্যঞ্জনা আধুনিক যুগের বাস্তবরুচির বর্ধিত দাবীকে তৃপ্ত করিতে পারিবে না। কাজেই তিনি বিষয়-নির্বাচন ও আলোচনা-পদ্ধতি উভয় দিকেই এক নূতন প্রণালী অবলম্বন করিলেন। তাঁহার 'চোখের বালি' (১৯০৩) ও 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) এই দুই উপন্যাস এই মৌলিকতার প্রথম প্রয়োগস্থল। 'চোখের বালি'তে তিনি বিধবার নীতিবিগর্হিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার ঘাতপ্রতিঘাত,

ইহার উন্মুখতা-বিমুখতার, পুঙ্খানুপুঙ্খ দিনলিপির মত তথ্যসম্বলিত বিবরণ দিয়াছেন—প্রতিদিনের গ্লানি-বিরোধ ও আকুলতার কাহিনী পুঞ্জীভূত করিয়া সমস্ত মানস অবস্থাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। অবশ্য এই তথ্য-সংকলনের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি বিনোদিনীর মনে অপ্রাপনীয়ের প্রতি ব্যাকুল লোলুপতা, আদর্শ-লোকের স্বপ্নবিভোরতা প্রভৃতি ঊর্ধ্বলোকচারী বৃত্তির ক্রিয়াও দেখাইয়াছে, এবং শেষ পর্যন্ত বাস্তবতার সহিত দ্বন্দ্বে এই আদর্শবাদই জয়ী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চিরন্তন কবিটি কখনো বস্তুশিল্পীর নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে নাই—তাঁহার বাস্তবতার কাব্যানুরঞ্জনেই তাঁহার বিশেষত্ব। তথাপি 'চোখের বালি'র সহিত 'বিষবৃক্ষে'র উচ্ছ্বাসময়, তথ্যবর্জিত, সাংকেতিকতায় সংক্ষিপ্ত আলোচনাপ্রণালী তুলনা করিলেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট হইবে। 'নৌকাডুবি'তে আকস্মিক সংঘটনের অতি-প্রাদুর্ভাব রমেশ-কমলার সম্পর্কের সূক্ষ্ম পরিবর্তন স্তরসমূহের নিখুঁত, সত্যানুসন্ধানী বিবৃতির দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে—লেখক ঘটনার অসাধারণত্ব অপেক্ষা মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের নিয়মানুবর্তিতার প্রতি অধিক মনোযোগী হইয়াছেন। অবশ্য বাস্তবতার উদাহরণ হিসাবে 'নৌকাডুবি'র স্থান 'চোখের বালি'র অনেক নিম্নে—লেখক শেষ পর্যন্ত অসম্ভব ঘটনার নূতন নূতন জালে জড়াইয়া পড়িয়া, ও এইসমস্ত আকস্মিকভাবে উদ্ভূত সমস্যার একটা সুলভ সমাধানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার বাস্তবপ্রীতিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। তথাপি মোটের উপর এই দুই উপন্যাসে অবলম্বিত প্রণালীর অভিনবত্ব বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুইখানি উপন্যাস, 'বৌঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৪) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭), পুরাতন ঐতিহাসিক ধারারই অনুবর্তন। ইহাদের চরিত্রসৃষ্টি ও প্রতিবেশ-রচনায় একপ্রকার কুহেলিকাচ্ছন্ন অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়। ইহারা যেন কবির প্রথম কাব্যপ্রচেষ্টা 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতের' গদ্য সংস্করণ—তাঁহার অর্ধ-অবাস্তব, আলো-আঁধার-মিশ্র, গোধূলি-ম্লান কল্পনারই রক্তমাংসের নরনারীতে রূপান্তর-প্রয়াস। প্রতাপাদিত্য যেন মানুষ নয়, জীবনের যে ক্রুর নির্মমতা, হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে নির্দয় পেষণে পীড়িত করে, তাহারই প্রতিচ্ছবি। উদয়াদিত্য ও বসন্ত রায় কবির গভীরতর অনুভূতির বাহন বলিয়া অপেক্ষাকৃত সজীব—বিশেষতঃ বসন্ত রায় তাঁহার, জীবনের মর্মজ্ঞ, আনন্দ-বিহ্বল দাদাঠাকুর-সম্প্রদায়ের অগ্রদূত। 'রাজর্ষি'তে রঘুপতি ও রাজা আরও জীবন্ত; বিশেষতঃ রঘুপতির অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহার মানবিকতাকে বাড়াইয়াছে। তথাপি জয়সিংহের প্রতি অগাধ স্নেহে কোমল ও রাজার প্রতি অনমনীয় বিরোধিতায় বজ্রকঠোর—রঘুপতি চরিত্রের এই দুই বিকাশ জীবনের রহস্যময় সমন্বয়ে এক হইয়া যায় নাই। নক্ষত্র রায়ের চরিত্র পরিবর্তন ও গ্রামবাসীদের কুসংস্কার প্রবণতা বর্ণনার মধ্যে লেখকের মনস্তত্ত্বজ্ঞানের কিঞ্চিৎ আভাস মিলে।

২

এই পরীক্ষামূলক দুইটি রচনার পর 'চোখের বালি'তে (১৯০২) লেখকের আশ্চর্য পরিণতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এই উপন্যাসই নূতন বাস্তবতা-প্রধান রীতির প্রথম উদাহরণ। মহেন্দ্র, বিহারী, বিনোদিনী, আশা—ইহারা সকলে মিলিয়া নিজ নিজ ইচ্ছা আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে

এক সাধারণ বাঙালী-পরিবারে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার বিভিন্ন সূত্রগুলি অদ্ভুত সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিনোদিনী-চরিত্রই সর্বাপেক্ষা জটিল—মহেন্দ্রকে অভিভূত করিতে সে যে সুচিন্তিত কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে, পর্যায়ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা মহেন্দ্রের মোহাবেশকে ঘনীভূত করিয়াছে তাহার বিস্তারিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় লেখক এই নবপ্রবর্তিত বাস্তব-রীতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রকটিত করিয়াছেন। আবার এই বিনোদিনী-চরিত্রেই লেখকের কবিসুলভ আদর্শপ্রবণতা আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার বাস্তব চিত্রকে উদার বিস্তৃতি ও কাব্যসৌন্দর্য দিয়াছে।

'নৌকাডুবি'তে (১৯০৭) লেখক চরিত্রবিশ্লেষণ অপেক্ষা ঘটনা-বৈচিত্র্যের প্রতিই অধিক মনোযোগী হইয়াছেন। সমস্ত উপন্যাসের বিবর্তন নির্ভর করিতেছে এক ভুল পরিচয়ের ভিত্তির উপর। এই ভ্রান্ত ধারণা ঠিক বিচারসহ নহে—কমলার সত্যপরিচয় তাহার স্বল্পকাল-স্থায়ী শ্বশুরগৃহবাসের মধ্যেই রমেশের পরিজনবর্গের স্বাভাবিক কৌতূহলের দ্বারাই উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিত। এই ভুল ভাঙিলে উপন্যাসের অকাল-সমাধি হয় বলিয়া লেখক ইহাকে কতকটা অস্বাভাবিক উপায়েই বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। নৌকাযাত্রার স্বচ্ছ-সরল, ভারমুক্ত ও সৌন্দর্যানুভূতিপূর্ণ দিনগুলির মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ তীব্র ও চিত্তক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই বিশ্লেষণে উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ ও কৃতিত্ব। রমেশের চরিত্রে দ্বিধা-দুর্বলতা ও ঘটনাপ্রবাহে অসহায়ভাবে ভাসিয়া যাওয়ার প্রবণতাই তাহাকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে—কমলাঘটিত সমস্যা তাহার দৃঢ়চিত্ততার অভাবেই

তুচ্ছেদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত দাম্পত্য প্রণয়ের সহিত পরিচয়ে কমলার নিজের দাম্পত্যজীবনের শূন্যগর্ভতার উপলব্ধি, খাঁটির সহিত তুলনায় মেকির স্বরূপোদ্ঘাটন—লেখকের মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সুন্দর উদাহরণ। গ্রন্থের শেষ অংশে কমলাকে স্বামীপরিবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে অতি নিপুণভাবে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চলিয়াছে তাহাতে কমলার ব্যক্তিত্ব ও গ্রন্থের আকর্ষণ উভয়েরই হানি হইয়াছে। গ্রন্থ-মধ্যে হেমনলিনীর চরিত্রই সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে; তাহার নীরব, অবিচলিত একনিষ্ঠতা, তুচ্ছ বাদপ্রতিবাদ ও কুৎসা-গ্লানির মধ্যে আত্মার অক্ষুণ্ণ নির্মলতা, তাহার চরিত্রের অবর্ণনীয় মাধুর্য—এই সমস্ত গুণেই সে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের উপন্যাস সমূহের নায়িকাদের অগ্রবর্তিনী।

'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিরাট পটভূমিকার মধ্যে তাঁহার আখ্যায়িকার বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই প্রতিবেশের মধ্যে তর্কপ্রবণতা ও তত্ত্বালোচনার যে সহজ অবসর আছে, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাসে তাহাই আরও প্রবল ও সর্বগ্রাসী হইয়া ঔপন্যাসিকের মূল উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়াছে। এই উপন্যাসের পরিধিতে বাংলাদেশের নবীন রাজনৈতিক জাগরণের সমস্ত উত্তেজনা, ধর্ম ও সমাজনীতির বিষয়ে মতবাদ-সংঘর্ষের সমস্ত বিক্ষোভ, নবপ্রবুদ্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষার সমস্ত সুদূরপ্রসারী তরঙ্গচাঞ্চল্য স্থান লাভ করিয়াছে। স্বদেশপ্রেমের উদ্দেশ্য ও প্রসার, ধর্মের মৌলিক প্রেরণা ও পরবর্তী বিকৃতি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা-নিয়ন্ত্রণে সমাজের অধিকারসীমা, প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ও

সংযম প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের আলোচনা তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও গভীর ভাবাবেগের সমন্বয়ে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বর্তমান উপন্যাসে তর্কপরিচালনা চরিত্রস্ফুরণ ও কলাকৌশলের মুখ্যতর উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া পরিমিতির সীমা লঙ্ঘন করে নাই।

এই বৃহত্তর পটভূমিকা ন্যস্ত হওয়ার ফলে উপন্যাসের চরিত্রগুলি প্রায়ই বিশিষ্ট মতবাদের প্রতিনিধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং উহাদের ব্যক্তিত্বস্ফুরণ কতক পরিমাণে প্রতিহত হইয়াছে। এইরূপ অভিযোগ 'গোরা' সম্বন্ধে শুনা যায়। কোনো বিশেষ অবস্থায় কে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবে, কোন্ যুক্তিধারা বা ভাবাবেগের আশ্রয়ে মনোবৃত্তিকে বহিঃপ্রকাশের সুযোগ দিবে তাহা আমরা পূর্ব হইতেই অনুমান করিতে পারি। পরেশবাবুর আধ্যাত্মিক পরিণতি ও অক্ষুণ্ণ চিত্তসংযম ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় উৎস অপেক্ষা ঘটনা-সংঘাত ও তর্কের অগভীর প্রবাহ হইতেই উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। মাতাকে আমরা আদর্শ জ্যোতির্বেষ্টিতারূপে দেখিতে অভ্যস্ত বলিয়াই আনন্দময়ীর আদর্শস্থানীয় স্নেহ, সহিষ্ণুতা ও আত্মবিলোপ আমাদের অস্বাভাবিক ঠেকে না—বিশেষতঃ তাঁহার অন্তরের গোপন ব্যথা, ও পরিবারের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ, তাঁহার আচার-ব্যবহারে গোঁড়ামির অভাবের রহস্যোদ্ভেদ তাঁহার ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। হারানবাবু, বরদাসুন্দরী প্রভৃতি উৎকট ধর্মাভিমানের প্রতিনিধিমূলক চরিত্রগুলিও মতবাদের অতিপরিপুষ্টিতে ব্যক্তিত্বের শীর্ণতা আবরণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে উৎকট হিঁদুয়ানির মুখপাত্র হরিমোহিনী তাঁহার জীবন-অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যের জন্য অনেকটা সজীব হইয়াছে—তাহার বঞ্চিত জীবনের রূঢ়

অভিঘাতই তাহাকে সুচরিতার উপর অধিকার বিস্তারে এরূপ উগ্র ও সন্দিগ্ধচিত্ত করিয়া তুলিয়াছে। মহিম সম্পূর্ণরূপে সুবিধাবাদী— তাহার প্রতিবেশে আদর্শ-সংঘাতে যে গভীর আলোড়ন উঠিয়াছে, সে তাহাকে তাহার ক্ষুদ্র সংসারচক্র ঘুরাইবার শক্তিরূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছে। তাহার খাঁটি স্বার্থপরায়ণতা কোনো মতবাদের ছায়ামণ্ডপে ঢাকা পড়ে নাই।

কিন্তু উপন্যাসের প্রধান চরিত্রসমূহ—গোরা, সুচরিতা, বিনয় ও ললিতা—এই মতবাদপ্রধান আবেষ্টনের মধ্যেই আপন আপন ব্যক্তিত্ব বিকশিত করিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে গোরা ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া এক বিরাট প্রতিনিধিত্বমূলক সত্তায় অধিষ্ঠিত মনে হয়। সে যেন ভারতবর্ষের নবোন্মেষিত তীব্র জাতীয়তাবোধের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই রাজনৈতিক সংগ্রামের উত্তেজনার মধ্যে তাহার নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনের গভীর তলদেশে প্রণয়ের রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগিয়াছে। সুচরিতার সহিত তাহার যে প্রকাণ্ড আদর্শগত ব্যবধান ছিল, তাহা কেবল সামাজিক মেলামেশার মৃদু আকর্ষণে অতিক্রান্ত হইত না। সুচরিতার শান্ত বহিঃপ্রকাশবিমুখ প্রকৃতিও কোনো সাধারণ আকর্ষণে বিচলিত হইয়া নিজ অপরিবর্তনীয় কক্ষপথ হইতে বিচ্যুত হইত না। মতবাদ-সংঘর্ষের তীব্র আলোড়নে তাহাদের সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতি যেন প্রবল ভূমিকম্পে আমূল বিপর্যস্ত হইয়াছে এবং এই বিপর্যয়কারী অভিজ্ঞতার মধ্যেই তাহাদের মধ্যে প্রেমের বিদ্যুৎ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই দাহ্যপদার্থপূর্ণ আবহাওয়াতেই ললিতার নির্ভীক, অবিচার-অসহিষ্ণু প্রকৃতি দুঃসাহসিক বিদ্রোহের অগ্নিশিখায়

জলিয়া উঠিয়া প্রেমের সমস্ত বাধাবিঘ্নকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়াছে। এক দ্বিধাদুর্বল, সুকুমার-প্রকৃতি বিনয়ই এই বিরুদ্ধ আকর্ষণে আন্দোলিত হইয়া অসুবিধায় পড়িয়াছে। তাহার যে স্নেহশীল প্রবৃত্তি কোনো বন্ধনকেই ছাড়িতে চাহে না, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে ব্যগ্র, বন্ধুত্ব ও প্রেম উভয়কেই আঁকড়াইয়া ধরিতে উন্মুখ, তাহা যেন এই খরবেগ আবর্তের মধ্যে পড়িয়া অসহায়ভাবে হাবুডুবু খাইয়াছে। সুকুমার হৃদয়-বিনিময়ের মসৃণ রাজপথ দিয়া তাহার অন্তরে যে প্রেমের আগমন স্বাভাবিক ছিল, অবস্থাবিপর্যয়ে তাহা আসিয়াছে আঁকাবাঁকা, কণ্টকময় পথে, প্রবল বিমুখতা ও বিভ্রান্তকারী অভিমানের ছদ্মবেশে। সুতরাং তর্কপ্রধান উপন্যাসে চরিত্রস্ফুরণ যে ব্যাহত হয় এই অভিযোগ অন্ততঃ গোরা, সুচরিতা ও ললিতার ক্ষেত্রে খণ্ডিত হইয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে।

৩

'গোরা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের চিরপ্রথাগত আঙ্গিকের অনুবর্তন করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই তাঁহার উপন্যাসের গঠন-রীতি অনেকটা পরিবর্তিত হইতে লাগিল। মননশীলতার আধিপত্য আরও নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। আবেগময় উপলব্ধি অপেক্ষা বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের প্রতি লেখকের প্রবণতা প্রাধান্য লাভ করিল। তিনি জীবনের সমগ্রতার পরিবর্তে ইহার সমস্যাসংকুল অংশের প্রতিই অখণ্ড মনোযোগ স্থাপন করিলেন। জীবনের ধারা-বাহিক আলোচনার মধ্যে সমস্যার উদ্ভব কিরূপে হইল তাহা প্রত্যক্ষ-ভাবে না দেখাইয়া, ঠিক যে অংশে ইহাতে জটিল গ্রন্থি পড়িয়াছে

তাহাতেই তিনি তাঁহার পূর্ণ বিশ্লেষণশক্তির নিয়োগ করিয়াছেন। গল্পের মধ্যে প্রকাণ্ড ফাঁকগুলি পূর্বালোচনার সাহায্যে, সার্থক আভাসে-ইঙ্গিতে, 'এপিগ্রাম'এর তীক্ষ্ণ, অর্থগূঢ় সাংকেতিকতায় পূরণ করার চেষ্টা হইয়াছে। ঐই প্রণালীতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির চোখ-ঝলসানো দীপ্তি আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। কিন্তু সব সময় আমাদের রসবোধের তৃপ্তি সাধন করে না। এই বুদ্ধির তীক্ষ্ণ অঙ্কুশে বিদ্ধ হইয়া গভীর শোকের দৃশ্যগুলিরও অন্তর্নিহিত করুণ রস যেন উবিয়া গিয়াছে; বিষাদগাম্ভীর্যের অশ্রুভারাতুর মেঘ এই বুদ্ধিগত সচেষ্টতার বায়ুপ্রবাহে বর্ষণের পূর্বেই ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ সকল চরিত্রের মুখেই এই সংক্ষিপ্ত, অর্থব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষার আরোপ নাটকীয় সুসংগতির আদর্শ লঙ্ঘন করিয়াছে।

'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের নূতন আদর্শ অনুযায়ী রচিত প্রথম উপন্যাস। দামিনী ও শচীশের সম্বন্ধ এত মুহুর্মুহুঃ ও দ্রুতবেগে পরিবর্তিত হইয়াছে যে কোনো সুসংবদ্ধ কেন্দ্রীয় চরিত্রানুবর্তনের সহিত এই পরিবর্তনগুলিকে গাঁথা দুঃসাধ্য। শচীশ ও দামিনীর চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ হইলে হয়ত এই পরিবর্তন-পরম্পরার শৃঙ্খলা সুস্পষ্টতর হইতে পারিত। কিন্তু পটভূমিকার সংকীর্ণতার জন্য ইহা যেন অনিয়-মিত খেয়ালের অস্থির ঘূর্ণীপাকের মতই ঠেকে। জগমোহনের জীবন-বিশ্লেষণ উপন্যাসে তাহার যে ন্যায্য স্থান তাহার তুলনায় অপরিমিতরূপ-দীর্ঘ হইয়াছে। বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদসমূহকে হঠাৎ একসূত্রে গাঁথিলে গঠন-সামঞ্জস্যের যে অঙ্গহানি হওয়া স্বাভাবিক, এখানে তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহার শিথিল ও অযত্নবিন্যস্ত আঙ্গিকের মধ্যে

লেখকের কবিত্বশক্তি ও মননশীলতা যেন উজ্জ্বলতর বর্ণে

'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) এই নূতন প্রণালীর সাফল্যের উদাহরণ। এই উপন্যাসে দাম্পত্যজীবনের একটি বিশেষ সমস্যা আলোচিত ও উপন্যাসের পরিধি এই সমস্যার প্রয়োজনে নিয়মিত হইয়াছে। নিখিলেশ ও বিমলার পূর্বজীবনের ইতিহাস ও তাহাদের সংসারের সাধারণ আবেষ্টনের বর্ণনা এই সমস্যা-কেন্দ্রের চারিদিকে সংক্ষিপ্তভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু সমস্যাপূর্ণ ঘটনাগুলির সম্বন্ধে লেখকের কৌতূহল রসমূলক নহে, প্রয়োজনমূলক। পতি-পত্নীর যে সম্বন্ধ চিরন্তন ও পরিবর্তনাতীত বলিয়া কীর্তিত হয়, তাহা প্রকৃত পক্ষে স্বামীর একাধিপত্যের নিকট স্ত্রীর নিরুপায় আত্মসমর্পণ। বাহিরের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হইলে এই সম্পর্কের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণ হইতে পারে না। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যেমন মিশ্র পদার্থের মৌলিক উপাদান নির্ণীত হয়, সেইরূপ বিমলাকে সন্দীপের প্রতি মোহাবিষ্ট করিয়া নিখিলেশের প্রতি তাহার প্রেমের বিশুদ্ধির পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিমলার প্রেম ক্ষণিক মোহবিহ্বলতা হইতে জাগিয়া শেষ পর্যন্ত এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সন্দীপকে নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিত্রিত না করায় পরীক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। সন্দীপের বাহিরের জাঁকালো রাজবেশের পিছনে লুক্কায়িত নীচ লোলুপতা অনাবৃত হইয়া পড়ায় বিমলার প্রেমের পক্ষে তাহার পূর্বকক্ষপথে প্রত্যাবর্তন সহজ হইয়াছে। লেখক নিখিলেশের প্রতি এরূপ পক্ষপাতমূলক ব্যবহার না করিলে পরীক্ষার ফল অনিশ্চিত হইত। নিখিলেশের উদার সহিষ্ণুতা

ও সমাজদত্ত অধিকার-প্রয়োগে একান্ত বিমুখতা, বিমলার মোহান্ধ দৃষ্টিবিভ্রম, সন্দীপের একপ্রকারের বিকৃত সমাজশৃঙ্খলাবিরোধী আত্মনাশী মহত্ত্ব, মেজবৌরানীর দৃশ্যতঃ ঈষৎ লালসা-মিশ্র কিন্তু অন্তরে বিশুদ্ধ ভালোবাসা—প্রত্যেক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহাদের মনোভাব বিশ্লেষণের দ্বারা চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদের কুটিল, বক্র নীতি, ইহার স্বার্থমূলক উদ্দেশ্য, ইহার হিংসা ও ছলনাময় কার্যক্রম, নিরীহের সর্বনাশের উপর প্রতিষ্ঠিত ইহার মিথ্যা বিজয়-গৌরবের প্রতি প্রসন্নতা দেখাইতে পারেন নাই ; তাই তাঁহার সমস্ত উপন্যাসেই তিনি ইহার ভাবোচ্ছ্বাসময় জোয়ারের নিচের পঙ্কিল স্তরটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। উপন্যাসটি সমস্যামূলক হইলেও, সমস্যার গভীর ব্যাপকতা, ঘাতপ্রতিঘাতের তীব্র আবেগময় অনুভূতি, আবেষ্টনের সুসমঞ্জস পূর্ণাঙ্গতা ও ভাষার ক্ষুরধার অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণতার জন্য ইহা পাঠকের মনে পূর্ণ পরিণত সমগ্রতার ধারণা ফুটাইয়া তোলে।

'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসে দাম্পত্যসম্পর্কের অন্যবিধ বিসদৃশতা আলোচিত হইয়াছে। মধুসূদন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও নির্মম শাসনশৃঙ্খলার প্রয়োগে বড়োমানুষ হইয়া এই লৌহকঠিন মনোবৃত্তি দাম্পত্যক্ষেত্রে বিস্তার করিতে চাহিয়াছে। সে পূর্ণ অপমানের প্রতিশোধ লইতে দেশের জমিদারকন্যা কুমুদিনীকে পত্নীরূপে পাইবার দাবি জানাইয়াছে ; কন্যার অভিভাবকের পক্ষে এই দাবি প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয় নাই। এই বিবাহপ্রস্তাবের মধ্যে কোথাও মাধুর্য বা প্রেমিক মনোভাবের লেশমাত্র নাই—আছে ঐশ্বর্যের অপরিসীম গর্ব ও গায়ে পড়িয়া অপমান করার ঔদ্ধত্য। কিন্তু কুমুদিনী মধুসূদনের

সমস্ত প্রভুত্বাভিমান ও পরুষ আত্মপ্রচারকে যেন যাদুমন্ত্রবলে প্রতিহত করিয়াছে। যে কবিত্বপূর্ণ সুকুমার অনুভূতি ও বাস্তবলঙ্ঘী আদর্শ-বাদের রাজ্যে সে বিচরণ করে, সেখানে মধুসূদনের সমস্ত ক্রূর পাশবিকতা আঘাতের শক্তি হারাইয়াছে। মধুসূদনের সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া সে যেন কতকটা উদ্ভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে—একপ্রকার অনভ্যস্ত কোমলতার দ্বারা সে কুমুদিনীর চিত্ত জয় করিতে চাহিয়াছে। কুমুদিনীর নিকট প্রত্যাশিত নতিস্বীকার না পাইয়া সে আবার শক্তিপ্রয়োগনীতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে—কুমুদিনীকে শিক্ষা দিবার জন্য ও আপনার আহত আত্মসম্মানের প্রলেপ স্বরূপ নির্লজ্জ প্রকাশ্যতার সহিত শ্যামাকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কুমুদিনীর পতিগৃহ পরিত্যাগের পর কয়েক অধ্যায় ধরিয়া স্ত্রীর স্বাধীনতা ও ন্যায্য অধিকারের আলোচনা বিরক্তিকর প্রসার লাভ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কুমুদিনী সন্তান-সম্ভাবিতা জানিয়া আবার মধুসূদনের নিকট ফিরিয়াছে—সন্তানস্নেহ আত্মসম্মানবোধকে অভিভূত করিয়াছে। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়গুলি রচনা হিসাবে পূর্বাংশের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট।

মধুসূদন ও কুমুদিনীর চরিত্র চমৎকারভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে। মধুসূদনের রূঢ়, অহংকারস্ফীত আধিপত্যস্পৃহা ও কুমুদিনীর স্বপ্নবিভোর, সুকুমার আদর্শপ্রবণতা এক সুন্দর সংঘর্ষ ও বৈপরীত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কুমুদিনী তাহার ভক্তিবিহ্বলতা ও আদর্শলোক-বিহার সত্ত্বেও অবাস্তব বলিয়া ঠেকে না। ইহাদের বিসদৃশ দাম্পত্য-সম্পর্ক গলস্‌ওয়ার্দির 'ফোরসাইট সাগা' উপন্যাসে সোম্‌স্‌ ও আইরিনের

কথা মনে পড়াইয়া দেয়। কিন্তু কুমুদিনী আইরিন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তাহার এই আচরণস্বাতন্ত্র্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ-বিভেদের সত্য প্রতিচ্ছবি। অন্যান্য চরিত্রের মুখে লেখক নিজ বুদ্ধিদীপ্ত, তীক্ষ্ণ বাক্‌বৈদগ্ধ্য আরোপ করিয়া কথোপকথনের সরস বৈচিত্র্যের কতকটা হানি করিয়াছেন। উপন্যাসের গঠনসৌষ্ঠব সম্পূর্ণ অনবদ্য না হইলেও, মধুসূদন ও কুমুদিনীর চরিত্র-পরিকল্পনা, তাহাদের বিরোধের স্তরবিন্যাসনৈপুণ্য ও কবিত্ব ও মননশক্তির একত্র সমাবেশ ইহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে।

'শেষের কবিতা' (১৯২৯) সমন্বয়-সৌন্দর্যে পরবর্তী উপন্যাসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। প্রেমের চিরন্তন রহস্য, ইহার অস্থির অতৃপ্ত সাফল্য, ইহার অসীমের প্রতি আকুতি, জীবনের শান্ত পদাতিক ছন্দের মধ্যে ইহার উন্মত্ত নৃত্যভঙ্গীর প্রবর্তন, ইহার উদ্দাম কল্পনাবিস্তার ও পরিণামে বাস্তবের সহিত অতর্কিত সন্ধিস্থাপন—এক কথায় ইহার প্রহেলিকাময় অসাধারণত্ব এই উপন্যাসের আকাশ-বাতাসে ঘনভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই উপন্যাসে প্রেম ও তাহার উত্তেজিত কল্পনারই একাধিপত্য; বাস্তব যতটুকু আছে তাহা এই কল্পনারই বহিরাবরণ মাত্র; তদতিরিক্ত প্রেমের স্বচ্ছন্দবিহারের পথে অন্তরায়। অমিত প্রেমে বিশ্বাসহীন, ইহার মোহাবেশের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপশীল, সমস্ত প্রথানুবর্তনের তীব্রভাবে বিরোধী—হঠাৎ শিলংএ লাবণ্যের দেখা পাইয়া তাহার জীবন-নীতি পরিবর্তন করিয়াছে। লাবণ্যও অমিতের উত্তেজনার স্পর্শে তাহার সমস্ত প্রকাশকুণ্ঠ জড়তা হারাইয়া তাহার অন্তঃনিরুদ্ধ নীরব প্রেমকে উচ্ছ্বসিত মুক্তি দিয়াছে। অমিতের কল্পনা এই নূতন অনু-

ভূতিতে আশ্চর্য সমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিয়াছে—প্রেমের মুহুর্মুহু পরিবর্তন-শীল ইচ্ছা ও খেয়াল তাহার মনে এক মোহাবেশের প্লাবন ছুটাইয়াছে। কিন্তু প্রণয়ের এই অপরিমিত উচ্ছ্বাসের মধ্যেই ইহার গূঢ় ব্যর্থতার বীজ নিহিত আছে। সীমাবদ্ধ জীবন ও অসীম আকুতির মধ্যে যে চিরন্তন ব্যবধান তাহারই পূর্বানুভূতি রহিয়া রহিয়া মিলনানন্দের মধ্যে অতৃপ্তির রেশ মিশাইয়াছে। অমিতের প্রেমের আদর্শ এই যে ইহার স্রোতোবেগ কোনো দিনই পথচলা শেষ করিয়া বদ্ধজলাশয়ে পরিণত হইবে না। নীড়রচনার ছবির পরিবর্তে অশ্রান্ত অগ্রগতির মধ্যে পথিপার্শ্বে ক্ষণ-স্থায়ী বাসর-শয়নের ছবি তাহার কল্পনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সাংসারিকতার বাঁধাধরা জীবনে প্রেমের পক্ষচ্ছেদ নিবারণের জন্য তাহার জল্পনা কল্পনা উদ্দাম হইয়াছে।

লাবণ্য অমিতের সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য অতৃপ্তিবোধ বুঝিতে পারিয়া অমিতকে পূর্বাহ্নেই তাহার অনিবার্য আশাভঙ্গ সম্বন্ধে সাবধান করিয়াছে। প্রেম সম্বন্ধে উভয়ের যে আদর্শ-বৈপরীত্য তাহা তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়াছে। অমিতের প্রেম আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে—লাবণ্যের প্রেম হৃদয়াবেগের পরিতৃপ্তির জন্য। অমিত প্রেম চাহে অগ্রগতির পথ আলোকিত করিতে, লাবণ্য চাহে তাহাকে অন্তঃ-পুরের স্থির মঙ্গলদীপরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে। কাজেই উভয়ের মধ্যে মিলন অসম্ভব। এই সংশয় অঙ্কুরিত হইবার পর বাহিরের বাধা আততায়ীশক্তির মত আসিয়া তাহাদের বিচ্ছেদকে আসন্নতর করিয়াছে। প্রেমের আস্বাদে লাবণ্যের নারীপ্রকৃতি জাগরিত হইয়াছে এবং নিশ্চিন্ত নির্ভর তাহার প্রধান কাম্য বলিয়া সে এক পূর্ব-

প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী, অতীত ইতিহাসের পথসন্ধানরত শোভনলালকেই নিজ অবিচল আশ্রয়রূপে বরণ করিয়াছে। অমিত লাবণ্যের প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তাহার মনের দিক্‌চক্রবালে উদার বিস্তৃতি ও মুক্তি উপলব্ধি করিয়াছে—কিন্তু সাংসারিক জীবনযাত্রার জন্য পূর্বসহচরী কেতকী মিত্রের সাহচর্যেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ অগ্রগতি তাহার মানস বিলাস ও নীড়রচনা তাহার বাস্তব কার্যক্রম দাঁড়াইয়াছে এবং এই উভয়ের মধ্যে অনৈক্যকে সে কোনোমতে মিলাইয়া লইয়াছে। উভয়ের শেষ কবিতা প্রেম সম্বন্ধে তাহাদের পারস্পরিক মনোভাবকে চমৎকার ভাবে অভিব্যক্তি দিয়াছে। 'শেষের কবিতা'তে প্রেমের যে কাব্যরূপ দেওয়া হইয়াছে, গীতিকবিতার যে অবিচ্ছিন্ন সুরে সমস্ত আখ্যানটিকে বাঁধা হইয়াছে, তাহা উপন্যাসসাহিত্যে তুলনারহিত। চরিত্রবিশ্লেষণ, কাব্যসৌন্দর্যসৃষ্টির সহিত তুলনায় লেখকের গৌণ উদ্দেশ্য হইলেও, সুসম্পাদিত হইয়াছে। অমিত ও লাবণ্যের প্রেমের শেষ পরিণতি, উপন্যাসের নিয়ম অনুসারে, তাহাদের চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। চরিত্রসংগতির মানদণ্ডে বিচার করিলে লাবণ্যের পরিবর্তন বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে; কিন্তু অমিতের কেটিকে পত্নীরূপে গ্রহণ তাহার চরিত্র ও পূর্ব-ইতিহাসের অনুবর্তন করে না। ইহাই গ্রন্থটির অনবদ্য সৌন্দর্যের মধ্যে একমাত্র ত্রুটি।

৪

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার যে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অন্তর্নিহিত বিপদ পূর্ণ-প্রকটিত হইয়াছে 'দুই বোনে' (১৯৩৩)। সমস্যাপ্রধান উপন্যাসে সমস্যা যদি এতই প্রাধান্য লাভ করে

যে জীবনের স্বাধীন স্ফুরণ তাহা দ্বারা অভিভূত হয়, তবে উপন্যাস হিসাবে ইহা নিকৃষ্ট হইতে বাধ্য। 'দুই বোনে' উপন্যাসের সমস্যা আলোচনায় লেখক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের গবেষণাপদ্ধতির শুষ্ক নীরস প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন। এখানে শর্মিলা ও ঊর্মিমালা দুই ভগ্নী নারীর মাতৃত্ব ও প্রেয়সীত্বের প্রতীকরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, এবং ইহাদের ব্যবহার ও মনোবৃত্তি অতি কঠোর ভাবে, পূর্বনির্দিষ্ট সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে। কোনো আকস্মিক প্রাণের উচ্ছ্বাস, বক্ষ-রক্তে কোনো নিগূঢ় দোলা তাহাদিগকে এই প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচয়ের সীমা অতিক্রম করিতে প্রেরণা দেয় নাই। তাহাদের প্রতি পদক্ষেপ যেন একটি সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর মাত্র। নির্বাচিত ঘটনাগুলিও যেন জীবনবৃন্তের স্বচ্ছন্দ বিকাশ নহে, সমস্যার বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে সংগৃহীত, সমস্যাচক্র ঘুরাইবার হাতল। শর্মিলার মাতৃভাবপ্রণোদিত সেবা-যত্ন, স্বামীর সমস্ত অনাদর ঔদাসীন্য ও বিরক্তি সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ঊর্মির প্রেয়সীত্বের ক্ষণস্থায়ী খেয়াল কাটিয়া যাওয়াতে সে বিলাত পলাইয়া জ্যেষ্ঠাকে হস্তচ্যুত অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দিয়াছে। ঊর্মিমালার যৌবনোচ্ছল খেয়ালী প্রকৃতি শশাঙ্ককে প্রথম প্রেমের বৈচিত্র্য আস্বাদন করাইয়াছে, কিন্তু তাহার আকর্ষণ অনেকটা কিশোরসুলভ ক্রীড়াচপলতাতেই সীমাবদ্ধ। তাহার মধ্যে রবীন্দ্র-নাথের পূর্ব নায়িকাদের নিগূঢ় মাধুর্যের লেশমাত্র নাই; তাহার অনুভূতির মধ্যে কোনোপ্রকার ভাবগভীরতার স্পর্শ নাই। নীরদের সহিত বিচ্ছেদে, শশাঙ্কের সহিত নূতন সম্পর্কস্থাপনে, বা দিদির নিকট

বিদায়সম্ভাষণে কোথাও প্রবল আবেগের সুর ধ্বনিত হয় নাই। শর্মিলার অগ্নিপরীক্ষা আমাদের মনে যে করুণ রসের সম্ভাবনা জাগায়, লেখকের লঘু ব্যঙ্গপ্রধান আলোচনায় তাহা সার্থক হইতে পায় না— তাহার দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রু যেন বিজ্ঞানপরীক্ষাগারের যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। বর্ণনাপদ্ধতিও প্রত্যক্ষ ঘটনার সরস অনুভূতি নহে, পূর্বজ্ঞাত পুরাতন ঘটনার শুষ্ক সারসংকলনের মত ঠেকে। রবীন্দ্রনাথের শেষ-জীবনের উপন্যাসে যে অবনতি কাব্যসৌন্দর্যপ্রাচুর্য ও তীক্ষ্ণ মননশীলতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল, বর্তমান উপন্যাসে এই সমস্ত গুণের অভাব জন্য তাহা একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

'চার অধ্যায়ে' (১৯৩৪) 'ঘরে-বাইরে'র মত রাজনৈতিক বিপ্লববাদ লেখকের আলোচ্য বিষয়। বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে নায়ক অতীনের অভিযোগ ত্রিবিধ—তাহার নীতিজ্ঞান, আত্ম-বিকাশ ও প্রেম তিনই ইহার প্রভাবে খর্ব ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। দেশ-প্রীতিকে ধর্মের উপর স্থান দিলে সাময়িক প্রয়োজনের জন্য সনাতন নীতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিশেষতঃ বিপ্লববাদের গোপন সুড়ঙ্গ-অভিযান বীরত্ব অপেক্ষা কাপুরুষতারই সমধর্মী। দ্বিতীয়তঃ কবি হিসাবে অতীনের ইহার বিরুদ্ধে আরও অনুযোগ আছে—দলের মতানুবর্তন ও হৃদয়ের সুকুমার বিকাশের নির্মম প্রতিরোধ কবির বৈশিষ্ট্যস্ফুরণের পরিপন্থী। তৃতীয়তঃ অতীনের গভীরতম বেদনা-বোধের উৎস তাহার প্রেমের অপমান ও ব্যর্থতা। প্রেমের পথ অনুসরণ করিয়াই সে বৈপ্লবিকতার ষড়যন্ত্রজালে জড়াইয়া পড়িয়াছে—এলার প্রসন্নতা অর্জন করিবার মোহেই সে তাহার কর্মপন্থার অনুবর্তন

করিয়াছে। কিন্তু এই আন্তরিকতাহীন অনুকরণে তাহার উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়ই নাই, পক্ষান্তরে এলার মনেও সংশয় ও মোহভঙ্গের ধূম্রজাল সঞ্চারিত হইয়াছে। এলার আচরণ প্রহেলিকাই রহিয়া গিয়াছে—তাহার আত্মবিমূঢ় দ্বিধাগ্রস্ত ভাব, স্বপ্নসঞ্চরণের মত অর্ধ-অচেতন মোহাবিষ্ট প্রচেষ্টা, অনিশ্চিত শঙ্কার সম্ভাবনায় কণ্টকিত উদ্‌ভ্রান্তি, অতীনের প্রেমনিবেদনে অসাড় নিষ্ক্রিয়তা এই সমস্তের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিলে না। বৈপ্লবিকতার নেত্রীর এরূপ অদ্ভুত পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিমূঢ়তার যতটুকু কারণ আমরা পরোক্ষভাবে সংগ্রহ করিতে পারি তাহা পর্যাপ্ত মনে হয় না! অথচ উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ সমস্যা ইহাই।

উপন্যাসের সত্যকার দুর্বলতা প্রতিবেশ রচনায়। বিপ্লববাদের চিত্র অনৈতিহাসিক, এই অভিযোগের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে এ প্রশ্ন অবান্তর। ইহা উপন্যাসবর্ণিত প্রেমের বিশ্বাসযোগ্য পটভূমিকা কি না তাহাই সমালোচকের প্রকৃত আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এই দিক দিয়া বিচার করিলেও প্রতিকূল মতের যথেষ্ট অবসর আছে। বিপ্লববাদকে প্রেমের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিত্রিত করা হয় নাই। অতীনের অভিমানক্ষুব্ধ আবেগময় প্রেমে এলার ঔদাসীন্যকে স্বাভাবিক করিতে হইলে বৈপ্লবিকতার যে তীব্র, বিপরীতমুখী আকর্ষণ দেখানো প্রয়োজন, উপন্যাসে তাহার কোনো উদ্যোগ নাই। সন্ত্রাসবাদের নেতা ইন্দ্রনাথ ইহার নৈতিক সমর্থন উদ্দেশ্যে যে সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে তাহা পরস্পরবিরোধী ও সংহতিহীন। সন্দীপের বিপ্লববাদের বিশ্লেষণে যে মাদকতা, হৃদয়াবেগের যে তীব্র ঐকান্তিকতা আছে, এখানে যুক্তিবাদের

ঘোরালো মারপ্যাঁচের পিছনে সেরূপ কোনো দুর্জয় প্রেরণা নাই। আন্দোলনের কর্মিবৃন্দের চরিত্রে স্থূল সুবিধাবাদ, ইতর লোলুপতা ও সর্বপ্রকার আদর্শবাদের বিরুদ্ধে একটা সুলভ বক্রোক্তিপ্রবণতা প্রধান উপাদান। এমন কি, ইহার প্রতিবেশের মধ্যে আসন্ন বিপদের হৃৎকম্পকারী শিহরণের সুরটিও ভালো করিয়া ফুটে নাই। চারিটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রতিবেশের যে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ চিত্র রূপ ধরিয়াছে, তাহাতে উপন্যাসবর্ণিত ঘাতপ্রতিঘাতের উপযোগী প্রশস্ত রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয় নাই—মনে হয় যেন লিখিত চারি অধ্যায়ের পিছনে অলিখিত অনেকগুলি অধ্যায় তাহাদের অকথিত বাণী লইয়া মুক্তি প্রতীক্ষা করিতেছে। সাংকেতিকতার অনিপুণ প্রয়োগ ও তাহার ফলে পট-ভূমিকার অনিশ্চিত উপলব্ধি গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি। এই অস্বাভাবিক আবেষ্টনের প্রভাব একমাত্র অতীনের নৈরাশ্যক্লিষ্ট, আত্মগ্লানি ও ব্যর্থতাবোধের তীব্র জ্বালাময় প্রেমের মধ্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে—এইখানেই আমরা বিপ্লববাদের কণ্ঠরোধকারী পেষণশক্তির পরিমাপ করিতে পারি।

'মালঞ্চ' উপন্যাস (১৯৩৪) অতি ক্ষুদ্রাবয়ব। রুগ্না নীরজা স্বামীর প্রেম ও ফুলের বাগানের উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। তাহার স্বামী আদিত্য তাহারই ঈর্ষার ধাক্কায় বাল্যসঙ্গিনী ও কর্মসহচরী সরলার প্রতি ভালোবাসা আবিষ্কার করিয়াছে। সরলা দীর্ঘকালব্যাপী নীরব আত্মসংযমের পর এই অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত প্রেমকে স্বীকার করিয়াছে। রমেন সরলার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করিলেও,অনেকটা নির্লিপ্ত দর্শকের ন্যায় ; কিন্তু সহানুভূতির চক্ষে, এই ক্ষুদ্র প্রণয়-নাটকের

জটিল সংঘাত লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু উপন্যাসের আসল আকর্ষণ পুষ্পো-দ্যানকে কেন্দ্র করিয়া ঘনীভূত হইয়াছে। ফুলের বাগানটি যেন আদিত্য-নীরজার প্রেমের জীবন্ত নিদর্শন ও প্রতীক—উভয়ের মধ্যে একটি আশ্চর্য একাত্মতা রচিত হইয়াছে। কাজেই নীরজা তাহার ঈর্ষা-বিকৃত মনের সমস্ত ঐকান্তিকতা দিয়া মালঞ্চের উপর স্বত্বাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হইয়াছে—সে বুঝিয়াছে যে ফুলবাগানের উপর অধিকার হারাইলে সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর প্রেমও হারাইবে। শেলির The Sensitive Plant'-এর মত এখানেও মানবমনের সূক্ষ্ম কোমল অনুভূতির সহিত পুষ্পের পেলব ক্ষণস্থায়ী রমণীয়তার এক আশ্চর্য সাদৃশ্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। মালঞ্চের সুকুমার ক্ষয়শীল সৌন্দর্য এই ঈর্ষাদষ্ট প্রণয়-বিকৃতির চমৎকার পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ অপেক্ষা ভাব-সামঞ্জস্য মুখ্য বলিয়া শেষ দৃশ্যে নীরজার ঈর্ষার তীব্র অদম্য অভিব্যক্তি প্রতিবেশ-সুষমাকে পর্যুদস্ত করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। হলধর মালি ও রোশনী আয়ার জীবনের অতিবিস্তৃত বাস্তব আলোচনাও যেন উপন্যাসের ভাবগত সূক্ষ্ম সংগতির পরিপন্থী হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ রচনা 'তিন সঙ্গী' (১৯৪০) তিনটি ছোট গল্পের সমষ্টি। ইহাদের মধ্যেও লেখকের চিন্তাশীলতার অক্ষুণ্ণ শক্তি ও চরিত্রসৃষ্টির মৌলিক আভাস-ইঙ্গিতের পরিচয় মিলে। কিন্তু মোটের উপর ইহারা পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি; ভঙ্গী ও পরিকল্পনার কোনো লক্ষণীয় অভিনবত্বের নিদর্শন নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের

অগ্রগতির নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন এবং অতি-আধুনিক উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গী ও গন্তব্যপথ অনেকটা তাঁহার দ্বারাই নির্ধারিত হইয়াছে। বাংলা উপন্যাসের উপর তাঁহার প্রতিভার ছাপ অবিস্মরণীয়, তথাপি মনে হয় যে উপন্যাস তাঁহার আত্মপ্রকাশের মুখ্য উপায় নহে। উপন্যাসের যে সমস্ত বিষয় তিনি নির্বাচন করিয়াছেন তাহা জীবনের কেন্দ্রে নহে, প্রত্যন্তপ্রদেশে অবস্থিত। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সাধারণ বাস্তব ছবি, ইহাদের ক্ষুদ্র সংঘাত ও সংকীর্ণ পরিধি তাঁহাকে আকর্ষণ করে নাই। যে সমস্ত সমস্যা তাঁহার আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে, যে সমস্ত নরনারী তাঁহার উপন্যাসে নিজ নিজ জীবনধারা প্রবাহিত করিয়াছে তাহাদের সকলের উপরেই অসামান্যত্বের স্পর্শ বিদ্যমান। গোরা, আনন্দময়ী, নিখিলেশ, সন্দীপ, অমিত, লাবণ্য, কুমুদিনী—ইহারা আমাদের ঠিক প্রতিবেশী নহে, আমাদের সাধারণ জীবনের অংশীদার নহে। ইহাদের নিগূঢ় ব্যক্তিত্ব, বাঙালি-সমাজের আবেষ্টনে বাস করিলেও, বাঙালির জীবনরসধারায় অভিষিক্ত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও পরিবার-নিরপেক্ষ। ইহারা প্রতিভার তুঙ্গ শৃঙ্গে, নিজ নিজ কল্পনার কুহেলিকা মণ্ডিত হইয়া, নিজ নিজ অনন্যসাধারণ আত্মার জ্যোতির্মণ্ডল বেষ্টিত হইয়া, মহিমাময় একাকিত্বে বিরাজ করে। এই নিঃসঙ্গতার জন্যই শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রদের সহিত ইহাদের একটা জাতিগত পার্থক্য আছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসক্ষেত্রে, তাঁহার গভীর প্রভাব সত্ত্বেও কোনো নূতন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হন নাই। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় লোকোত্তর প্রতিভা-সম্পন্ন কবি যদি পুনরাবির্ভূত হইয়া উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন, তবেই

তাঁহার নিজস্ব সুর ও আলোচনাভঙ্গী সার্থকভাবে অনুসৃত হইতে পারে।

৫

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির মধ্যে অনবদ্য কলাশিল্প ও গঠন-কৌশল, আশ্চর্য বৈচিত্র্য ও প্রসার ও কাব্যসৌন্দর্য ও ঔপন্যাসিক চিত্তবিশ্লেষণের অদ্ভুত সমন্বয় পাওয়া যায়। বাঙালি-জীবনের সংকীর্ণ পরিধি ও অন্তর্গূঢ় ভাবগভীরতার সহিত ছোটগল্পের একটি সহজ সামঞ্জস্য আছে। বৃহৎ উপন্যাসের মধ্যে বর্ণনীয় বিষয়ের কৃশ স্বল্পতায় জন্য প্রায়ই একটা শূন্যগর্ভ স্ফীতি অনুভব করা যায়। ছোটগল্প আমাদের জীবনের গতিবেগ ও রসোচ্ছলতার সঙ্গে মাত্রাসাম্য বজায় রাখিয়া চলিতে বেশি উপযোগী। কাজেই মনে হয় যে, যে পর্যন্ত আমাদের জীবন আরও ঘটনাবহুল ও রসসমৃদ্ধ না হয়, সে পর্যন্ত ইহাদের ক্ষুদ্র আলোড়নটুকু ছোটগল্পের কারুকার্যখচিত পেয়ালা-টিতেই অধিকতর শোভন ও সংগতভাবে ধৃত হইতে থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে আমাদের যন্ত্রবদ্ধ, বৈচিত্র্যহীন জীবনে যে সুপ্রচুর রসধারা ও সূক্ষ্ম অনুভূতিময় সৌন্দর্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তাঁহার প্রেমের গল্পগুলিতে লেখক কবি ও মনস্তত্ত্ববিদের দৃষ্টি লইয়া জীবনের উপর ইহার দুর্বার শক্তি ও নিগূঢ় প্রভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কতকগুলিতে, যথা 'একরাত্রি', 'মানভঞ্জন', 'দুরাশা', 'অধ্যাপক' প্রভৃতিতে প্রেমের কবিত্বময়, উচ্ছ্বসিত অভি-ব্যক্তির দিকটাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; ইহাদের মধ্যে মনস্তত্ত্ব-

বিশ্লেষণের বিশেষ পরিচয় নাই। 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান' ও 'মধ্যবর্তিনী' এই তিনটি গল্পে কবিত্বের সহিত চিত্তবিশ্লেষণের আশ্চর্য সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছে। 'সমাপ্তি'তে এক দুরন্তপ্রকৃতি বালিকা প্রেমের মায়াদণ্ডস্পর্শে অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রণয়বিগলিতা, সংকোচমধুরা তরুণীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। 'দৃষ্টিদানে' অন্ধ পত্নীর স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতি-সৌকুমার্য ও অপরাধী স্বামীর প্রতি কোমল স্নিগ্ধশীতল মনোভাবের চমৎকার বর্ণনা। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে আমাদের পারিবারিক জীবনে হঠাৎ উন্মেষিত প্রেম উদ্দাম গতিবেগ ও অধীর ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রৌঢ় দম্পতি নিবারণ ও হরসুন্দরী, এই ভাববন্যার অতর্কিত উচ্ছ্বাসে হাবুডুবু খাইয়াছে।

কতকগুলি গল্পে আমাদের পারিবারিক জীবনের দৃঢ় বেষ্টনীরেখার বহির্ভূত, অস্থায়িত্বের বেদনাভরা বিচ্ছেদশঙ্কাবিজড়িত স্নেহসম্পর্ক চমৎকার অভিব্যক্তি পাইয়াছে। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে প্রবাসী পোস্ট-মাস্টারের সঙ্গে অনাথা বালিকা রতনের মধুর সম্বন্ধটি এইরূপ ব্যাকুল অনিশ্চয়তার জন্য কারুণ্যরসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পেও প্রয়োজনের সংস্পর্শ অস্থায়িত্বের অভিশাপগ্রস্ত প্রীতি-বন্ধনে উন্নীত হইয়া অনুরূপ মর্মবেদনার সৃষ্টি করিয়াছে। 'ব্যবধান' ও 'মাস্টারমশায়' গল্পে পারিবারিক বিরোধ ও বৈষম্যের প্রতিকূল আবেষ্টনে অন্তরের সহজ প্রীতি হিমশীর্ণ পুষ্পের ন্যায় ব্যথাভরা কুণ্ঠিত আবেদনে নিজ অস্তিত্বের পরিচয় দিয়াছে।

আমাদের পারিবারিক সম্বন্ধের মধ্যেও অনেক সময় যে স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা অনভ্যস্ত প্রণালীতে সঞ্চারিত হইয়া জটিলতার সৃষ্টি

করে তাহার অনেকগুলি সুন্দর উদাহরণ কতকগুলি গল্পে সংগৃহীত হইয়াছে। পরে শরৎচন্দ্র এই জাতীয় বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ ও তীব্রতর ভাব-সংঘাত প্রবর্তন করিয়াছেন। 'পণরক্ষায়' বংশীবদন ও রসিকের যে সাধারণ ভ্রাতৃসম্পর্ক তাহার মধ্যে ভ্রাতৃস্নেহের অজস্র উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়াছে। 'রাসমণির ছেলে' গল্পে পিতৃস্নেহ ও মাতৃস্নেহ পরস্পর প্রকৃতি-পরিবর্তনের দ্বারা ফল-বৈপরীত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। 'দিদি' গল্পে নাবালক ভাইয়ের হিতৈষণা লইয়া স্বামী-স্ত্রীর নীরব দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত সাংঘাতিক পরিণতিতে পৌঁছিয়াছে।

কয়েকটি গল্পে পরিবারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহকাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'হালদারগোষ্ঠীতে বনোয়ারিলাল তাহার পরিবার-নির্দিষ্ট আসন উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুশীলনে নিজ প্রেমের উচ্চ আদর্শ রক্ষার দুরূহ ব্রতসাধনে উদ্যোগী হইয়াছে। কিন্তু পত্নী কিরণলেখা তাহার এই কৃচ্ছ্রসাধনের মর্যাদা না বুঝিয়া স্বামীর বিরোধী-দলে যোগ দিয়াছে। সে প্রেমিক-স্বামীর প্রেয়সী অপেক্ষা হালদার-গোষ্ঠীর বড়বউএর পরিচয় শ্লাঘ্যতর মনে করিয়াছে। 'ঠাকুরদা' গল্পটিতে বংশগৌরবের করুণ আত্মপ্রতারণা লেখকের সহানুভূতি-পূর্ণ স্নিগ্ধ কৌতুকসম্পাতে হৃদয়গ্রাহী ও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টি আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রার সহিত বহিঃপ্রকৃতির নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মানবমনের অতি সাধারণ ভাব ও জীবনের তুচ্ছ সংঘটনের উপর এক অসাধারণ মহিমা আরোপ করিয়াছে। কতকগুলি গল্পে মানব ও প্রকৃতির এই নিবিড়, অন্তরঙ্গ পরিচয়ের কাহিনী উদ্ঘাটিত হইয়াছে। 'অতিথি' গল্পটি এই

একাত্মতার সুন্দরতম উদাহরণ। তারাপদর মধ্যে ধরিত্রীর উদার অনাসক্তি, প্রকৃতির মোহমুক্ত অবাধ অগ্রগতি যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সে যেমন সহজে সকলের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে, তেমনি সহজেই সমস্ত মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির চিরচঞ্চল পথিক জীবনের ছন্দ অনুসরণ করিতে পারে। যেদিন শুষ্ক নদীতে আষাঢ়ের প্রথম গৈরিক প্রবাহ বৃহত্তর জগতের আবাহন আনিয়াছে, যেদিন উপরের নীল স্থির আকাশে জলভরা মেঘের শ্রান্তিহীন পদসঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, রথযাত্রার উৎসব যেদিন স্থিতিশীল মানুষের মনে এই জঙ্গম সৃষ্টির মর্মরহস্যবাণীর ইঙ্গিত বহন করিয়াছে, সেইদিন তাহার মনেও প্রকৃতির জলস্থল-আকাশে পরিব্যাপ্ত এই গতি-প্রেরণা কোন্ অলক্ষ্য সহানুভূতির সূত্রে সঞ্চারিত হইয়াছে। 'মহামায়া' গল্পে মানবমনের সুপ্ত আবেগ বহিঃপ্রকৃতির মায়াময় নিগূঢ় প্রভাবে, চন্দ্রাকর্ষণে সমুদ্রবৎ, কিরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা অনুপম কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'সুভা' গল্পে এক বাক্‌শক্তিহীন বালিকার সঙ্গে মূক বহিঃপ্রকৃতির কি রহস্যময় ভাববিনিময়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি ঈর্ষাপরায়ণ, অনাদরক্ষুব্ধ অনাথ বালক নীলকণ্ঠও প্রকৃতির সহিত সম্পর্কান্বিত, মুক্ত জীবনের প্রসাদে চরম হেয়তা ও কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এইরূপে নানা গল্পের ভিতর দিয়া কাব্যজগতের ছন্দোবদ্ধ রহস্য বাস্তবজীবনের রূঢ় সুষমা-হীনতা ও অকিঞ্চিৎকরতার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অতিপ্রাকৃতবিষয়ক গল্প কল্পনার ঐশ্বর্যে ও ভৌতিক ভীতি-শিহরণের উদ্রেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠগল্প-সংগ্রহের মধ্যে

স্থান পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার 'নিশীথে', 'মণিহারা' ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে তিনি নিতান্ত সহজভাবে, কোথাও সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন না করিয়া, অতিপ্রাকৃতের উপযোগী প্রতিবেশ রচনা করিয়াছেন। 'নিশীথে' গল্পে মৃত প্রথম স্ত্রীর প্রতি অবিচারের আত্মগ্লানিপীড়িত স্বামীর মস্তিষ্কবিকার, ও স্ত্রীর আর্তপ্রশ্নের আকাশ-বাতাসে বিকীরণের অপ্রাকৃত কাল্পনিক অনুভূতি তীক্ষ্ণ মর্মভেদী রেখায় উৎকীর্ণ হইয়াছে। 'মণিহারা'তে রহস্যপূর্ণ মরণের যবনিকাতলে অন্তর্হিতা প্রেয়সীর হিম-শীতল স্পর্শ, উদ্‌ভ্রান্ত স্বপ্নানুভূতির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া, এক নিবিড়, মৃত্যুগহন প্রতিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। 'ক্ষুধিত পাষাণে'ও মোহাভিভূত কল্পনা আপনার চারিদিকে অতীত যুগের বিলাসবিভ্রমপূর্ণ, রূপ-মোহের নিগূঢ় সংকেতে হিল্লোলিত, স্মৃতি ও কামনার সূক্ষ্মতন্তুজালের স্পর্শ-রোমাঞ্চিত এক অপরূপ বর্ণাঢ্য মায়াসৌধ রচনা করিয়াছে। অতিপ্রাকৃতের এই রহস্যঘন, ইন্দ্রিয় ও মনের সমস্ত অনুভূতিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্নকারী আবির্ভাবের চারিদিকে যে বাস্তব আবেষ্টন বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা ইহার ঐন্দ্রজালিক আবেশকে আরও নিবিড়তর করিয়াছে।

এই সমস্ত গল্প ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের বিশেষ সমস্যা লইয়া কতকগুলি গল্প রচনা করিয়াছেন। এইগুলিতে তিনি অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকদের অগ্রদূত ও পথপ্রদর্শক। এই সমস্যাগুলি এখনও আমাদের বুদ্ধির স্তর অতিক্রম করিয়া হৃদয়াবেগের গভীরতর স্তরে অবতরণ করে নাই—কাজেই রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাসের মত ইহাদের মধ্যে ভাবাবেগ অপেক্ষা বুদ্ধিগত আলোচনারই প্রাধান্য।

'নষ্টনীড়' গল্পটিতে পারিবারিক সম্বন্ধের মধ্যে নিষিদ্ধ আচারবিগর্হিত প্রেমের প্রথম অবতারণা হইয়াছে। দেবর ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে স্নেহ-সম্পর্কটি কেমন করিয়া দূষণীয় আকর্ষণের দুর্নিবার মত্ততার মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা অতি সুন্দর বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখানো হইয়াছে। এইরূপ কলঙ্কলাঞ্ছিত প্রেমের প্রগতি অপেক্ষা উদ্ভব-কাহিনীই অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক—যে প্রবল শক্তি সমাজের বহুশতাব্দীব্যাপী অনুশাসন ও বিবেকের বদ্ধমূল প্রতিরোধকে অভিভূত করিয়া আপনাকে সার্থক করিতে চেষ্টা করে, তাহাই বিশেষভাবে ঔপন্যাসিকের বর্ণনীয় বিষয় হওয়া উচিত। অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা ইহার আবির্ভাবকে স্বতঃস্বীকৃতির মতো ধরিয়া লইয়া থাকেন; রবীন্দ্রনাথ খুব ন্যায্য ভাবেই ইহার উদ্ভবের উপর বেশি জোর দিয়াছেন। 'স্ত্রীর পত্রে' পুরুষের বিরুদ্ধে লাঞ্ছিত নারীর বিদ্রোহবাণী তীব্র, অগ্নিজ্বালাময় ভাষাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই অভিযোগ অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক ও সমস্ত পুরুষজাতির প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া আর্ট অপেক্ষা প্রচার-সাহিত্যেরই পর্যায়ভুক্ত। 'পয়লা নম্বরে' অদ্বৈতচরণ ও সিতাংশু-মৌলির বিপরীতমুখী প্রকৃতি চিত্রণের সহিত অনিলার বিদ্রোহাত্মক স্বামীগৃহপরিত্যাগ অনেকটা আকস্মিকভাবে জড়িত হইয়াছে। 'নামঞ্জুর' গল্পে সভা করিয়া ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান ও রুগ্ন ভ্রাতার অবহেলা—এই দ্বিবিধ আচরণের মধ্যে যে আন্তরিকতার অভাব ও খ্যাতিলোলুপতা বিসদৃশভাবে প্রকট তাহা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিস্ময়কর বিস্তার ও বৈচিত্র্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বাঙালীজীবনের সমস্ত রসধারা নিঃশেষে পান

করিয়া তিনি অতি-আধুনিক যুগের যে সমস্ত অভিনব সমস্যা রসাভিষেকের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে তাহাদের আলোচনার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি অতীতের ও বর্তমানের রত্নভাণ্ডার অধিকার করিয়া ভবিষ্যতের নবাবিষ্কৃত, এখনো ভূগর্ভবিন্যস্ত সম্পদের দিকে তাঁহার বিজয়রথ চালনা করিয়াছেন। তিনি আপনার মধ্যে এক যুগের সমাপ্তি ও অপরের নবারম্ভ সম্মিলিত করিয়াছেন। ভবিষ্যতের কোন্ প্রতিভাবান লেখক তাঁহার আরব্ধকার্য শেষ করিবেন তাহা এখন কল্পনারও অতীত। যে নবযুগের সাহিত্যিককে তিনি তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসে আবাহন করিয়াছেন তাঁহার আবির্ভাবের জন্য সমস্ত দেশ উদ্‌গ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প এককালে পাঠকসমাজে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। বর্তমান যুগে সমস্যা-প্রবণতার অতি প্রাদুর্ভাবের জন্য তাঁহার লঘু, স্বচ্ছন্দ গতি, হাস্য-পরিহাসমধুর জীবনচিত্র ও অগভীর বিশ্লেষণ পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে না পারিলেও তাঁহার ছোটগল্পগুলির মধ্যে স্থায়িত্বের উপাদান আছে। রুচিপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আবার জনপ্রিয় হইবে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

প্রভাতকুমারের ছোটগল্পগুলির প্রধান আকর্ষণ সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের সমস্যামুক্ত, সুস্থ জীবনযাত্রার সরস বর্ণনা। এই জীবনের উপর কোনো তীক্ষ্ণকণ্টকিত সমস্যা অস্বস্তিকর প্রভাব বিস্তার করে নাই; দারিদ্র্য-অভাব মাঝে মাঝে ছায়াপাত করিলেও দৈবানুকূল্যে ইহার তীব্রতা হ্রাস হইয়া থাকে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ পারিবারিক শান্তিতে ভরা বাঙালী জীবনে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষম্য অসঙ্গতি স্বাভাবিক কারণে আবির্ভূত হয় লেখক তাহাদের রসানুভূতির দ্বারা বিশুদ্ধ, নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। ছোট-গল্পের আর্টের উপর তাঁহার অধিকার অসাধারণ। প্রত্যেকটি গল্প বিষয়নির্বাচনে, লঘু সরস আলোচনায়, অনবদ্য গঠনকৌশলে ও সমাপ্তির অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিকতায় সূর্যালোকস্পৃষ্ট শিশির বিন্দুর মতো

উজ্জ্বল। তাঁহার ছোটগল্প যে আকাশ-বাতাসের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে বয়স্কদের রূপকথার রাজ্য নামে অভিহিত করা যায়। লেখকের স্নিগ্ধ উদার মনোভাব, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি সদাজাগ্রত সহানুভূতি, সর্বপ্রকার আতিশয্য ও অবাঞ্ছিত পরিণতির পরিহার, অনুকূল দৈবের সুপ্রচুর দাক্ষিণ্য, শুচি, সংযত হাস্যরসের অবিকৃত মাধুর্য—এই সমস্ত মিলিয়া আমাদের কর্কশ, বাস্তব জীবনে যেন এক প্রকার কল্পলোকের অভ্যুদয় হইয়াছে। এই রাজ্যে অপহৃত অর্থ নানা বক্রপথে শেষ পর্যন্ত মালিকের সিন্দুকে পৌঁছায়; হারানো গহনার বাক্স ভাবীপুত্রবধূর যৌতুকে পরিণত হয়; অকালপক্ক বালকের প্রেম লেকে আত্মহত্যা না ঘটাইয়া পিতার মৃদু চপেটাঘাতে অন্তর্ধান করে; বিদেশ ভ্রমণে পৌরাণিক যুগের ন্যায় পত্নীলাভ হয় ও এই অতর্কিত পরিণতি পারিবারিক ব্যবস্থার শান্ত গতিচ্ছন্দে কোনো ছন্দপতন ঘটায় না। কাজেই লেখকের বিশেষ ব্যবস্থায় আমাদের প্রাত্যহিক জীবন, মোটামুটি বাস্তবতার অনুবর্তন করিয়াও, এক দৈবানুগৃহীত আদর্শলোকের সুষমামণ্ডিত হইয়াছে।

তাঁহার গল্পগুলি কেবল যে হাস্যকর অবস্থার জন্যই কৌতুকপ্রদ তাহা নহে; এই অবস্থার সহিত চরিত্রসঙ্গতিও সংযুক্ত হইয়াছে। 'বলবান জামাতা'য় কৌতুকাবহ অবস্থাবিভ্রাটের সঙ্গে নলিনীর রমণীসুলভ কোমলতা ক্ষালনের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা রসময়ীর মৃত্যুর পরও স্বামীর উপর নিজ কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখার আগ্রহাতিশয্য হইতে উদ্ভূত। 'প্রতিজ্ঞা পূরণ' 'নিষিদ্ধ ফল' ও 'বউচুরি' প্রভৃতি

গল্পে মানুষের অসম্ভব প্রতিজ্ঞা ও কৃচ্ছ্রসাধনপ্রয়াস প্রকৃতির অনিবার্য তরঙ্গোচ্ছ্বাসে গঙ্গাস্রোতপ্রবাহে ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া গিয়া হাস্যরস উৎপাদন করিয়াছে। 'খোকার কাণ্ড', 'যজ্ঞভঙ্গ' ও 'সারদার কীর্তি'তে আমাদের অতি প্রাকৃতে অন্ধবিশ্বাস অমূলক প্রতিপন্ন হইয়া হাস্য-কৌতুকের উপাদানে পরিণত হইয়াছে।

কতকগুলি গল্পে parody বা বিদ্রূপাত্মক অনুকরণের সাহায্যে হাস্যরসের অবতারণা হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষে' যে রমণীর ছদ্মবেশ শোকাবহপরিণতির বীজ বপন করিয়াছে, প্রভাতকুমারের গল্পে তাহাই উদ্ভট অবস্থার কারণ হইয়া প্রহসনোচিত কৌতুকরস যোগাইয়াছে। প্রভাতকুমারের 'পোস্ট্‌মাস্টার' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের তুল্যাভিধানে গল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত রীতি অনুসরণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বময় করুণ আবেদনপূর্ণ সুরের পরিবর্তে প্রভাতকুমারের গল্পে আছে এক প্রকারের হাস্যকর, বিকৃত রোমান্সপ্রবণতা; তাঁহার পোস্ট্‌মাস্টারের চোরাই পত্রের সংকেতানুযায়ী প্রেমাভিসার তাহার ভাগ্যে এক দিকে নির্যাতন, অপর দিকে দৈবানুগ্রহ স্বরূপ পদোন্নতি—এই শাস্তি-পুরস্কার-মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটাইয়াছে।

প্রভাতকুমারের দুই-একটি গল্পে অবৈধ প্রণয়ের কথা আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক সুরুচি জ্ঞান ও সংযম এই ব্যাপারে কোনোরূপ নিন্দনীয় আতিশয্যের প্রশ্রয় দেয় নাই। 'লেডি ডাক্তার' গল্পে এক ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকের মোহপাশে আবদ্ধ তরুণ ডেপুটি তাহার প্রণয়িনীর স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া সময় থাকিতেই আত্মসংবরণ করিয়াছে। 'সচ্চরিত্র' গল্পে পতিতার কন্যার দ্বারা আকৃষ্ট যুবক

পলায়নের দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়াছে। এই গল্পটি আধুনিক ঔপন্যাসিক-বর্গের সহিত প্রভাতকুমারের মনোবৃত্তির পার্থক্যের সুন্দর উদাহরণ। যে অসামাজিক প্রেম শরৎচন্দ্র প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের প্রধান উপজীব্য, যাহা হইতে ইঁহারা গভীর চিত্তবিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম জীবনসমালোচনার প্রেরণা সংগ্রহ করেন, প্রভাতকুমার তাঁহার নায়কের মর্যাদাহানি করিয়াও তাহার পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্ত হইতে তাহার আশু মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রভাতকুমারের রচনায় ভাব-গভীরতার অভাব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি ছোট গল্পে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। 'বাল্যবন্ধু' গল্পে নলিনীর দারিদ্র্যদুঃখ ও অন্তর্বিক্ষোভ তীব্রতার সহিত অনুভূত হইয়াছে; এখানে বিপন্মুক্তি আসিয়াছে বাল্য-সুহৃদের আপাত নির্মম ব্যবহারের ছদ্মবেশধারী প্রকৃত হিতৈষণার মধ্যবর্তীতায়। 'কাশীবাসিনী' গল্পে বিপথগামিনী মাতার দুহিতৃস্নেহ অসাধারণ উচ্ছ্বাসের সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। 'ভুল শিক্ষার বিপদে' বক্তার রুক্ষ ব্যবহারের মধ্য দিয়াই তাহার শোকাবহ অভিজ্ঞতার করুণ স্মৃতি উদ্বেলিত হইয়াছে। 'আদরিণী' গল্পে মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের দৃপ্ত পৌরুষ ও পরাজয়ের মর্মভেদী গ্লানি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে পুরুষোচিত জিদের বশে হাতী কিনিয়াছে ও হাতী বিক্রয়ের সময় তাহার চোখে যে অশ্রুজল প্রবাহিত হইয়াছে তাহা আত্মপৌরুষের পরাজয় ক্ষোভে লবণাক্ত।

প্রভাতকুমারের 'দেশী ও বিলাতী' নামক গল্পগুচ্ছে, বিলাতপ্রবাসী বাঙালী ও ইংরেজের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ প্রীতি-সৌহার্দ্য ও হৃদয়বিনিময়ের

চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতেও লেখকের ভাব-গভীরতার পরিচয় মিলে। এই গল্পগুলিতে ইংরেজ ও বাঙালী রাজনৈতিক হিংসাদ্বেষ ও জাতিগত বৈষম্য ভুলিয়া মানবিকতার সাধারণ ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে। 'কুমুদের বন্ধু', 'মাতৃহীনা', 'প্রবাসিনী', 'ফুলের মূল্য' প্রভৃতি গল্পে স্নেহ প্রেম সহানুভূতি প্রভৃতি সুকোমল হৃদয়বৃত্তি আচার-ব্যবহারের পার্থক্য, রুচিভেদ ও জাতিগত সংস্কারের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া ইংরেজ ও বাঙালীর মধ্যে মধুর প্রীতির সম্পর্ক রচনা করিয়াছে; স্বল্প পরিচয় ও অনিশ্চিয়তার প্রতিবন্ধক কাটাইয়া ব্যাকুল উচ্ছ্বাস ও আবেগের সহিত প্রবাহিত হইয়াছে। পরিচিত আবেষ্টনের উচ্ছ্বাসহীন ভাবপ্রবাহ অনভ্যস্ত সমাজপরিস্থিতির মধ্যে করুণ ব্যঞ্জনায় পূর্ণ ও চঞ্চল গতিবেগে হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রাজনৈতিক উত্তেজনা-বিষয়ক কয়েকটি গল্পেও প্রভাতকুমার হাস্যরসের উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকৃত humorist বা হাস্যরসিকের বিশেষত্ব এই যে, দুই বিরুদ্ধ পক্ষের উগ্র, আত্মবিস্মৃত উন্মাদনার মধ্যে তিনি মস্তিষ্ক স্থির ও বিচারবুদ্ধি অবিকৃত রাখিয়া হাস্যকর অসঙ্গতির প্রাচুর্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন। 'উকিলের বুদ্ধি' গল্পে তিনি দেখাইয়াছেন যে দুই পক্ষের এই সাময়িক মত্ততার সুযোগ লইয়া একজন চতুর উকিল কিরূপে নিজ চাকুরির সুবিধা করিয়া লইয়াছে। 'হাতে হাতে ফল' গল্পে দারোগার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে তাহার সুরাশক্তির জন্য, বিপ্লববাদীর বন্দুকের গুলিতে বা ব্যবস্থাপরিষদে অনলোদ্‌গারী বাগ্মিতায় নহে। 'খালাস' গল্পে স্বদেশী মোকদ্দমার বিচারক তাঁহার অবিচারমূলক

শান্তির জন্য পদত্যাগ করিয়াছেন, কতকটা বিবেকের দংশনে, কিন্তু প্রধানতঃ গৃহিণীর সন্তোষবিধানার্থ। এই সমস্ত গল্পে ভাবের উচ্চ সুরকে নিম্নগ্রামে নামাইয়া উচ্চ স্তরের বিষয়ালোচনার মধ্যে সাধারণ স্তরের বাস্তব প্রয়োজনের প্রবর্তন করিয়া লেখক রাজনীতির বিষোদ্গারের মধ্যে হাস্যরসের সুধা আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

২

প্রভাতকুমারের বড়ো উপন্যাসগুলি ছোট গল্পের সহিত তুলনায় অপকৃষ্ট রচনা। উপন্যাসের উপযুক্ত ব্যাপ্তি, অবিচ্ছিন্ন সংহতি ও বিশ্লেষণ-গভীরতা প্রভাতকুমারের রচনায় বিরল। কোনো কোনো উপন্যাস ভ্রমণ-কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত; কোথাও বা নানা অসংবদ্ধ বিষয়-বৈচিত্র্যের অবতারণার জন্য মূল উপাখ্যানের রস জমাট বাঁধে নাই। কোথাও বা মুখ্য নায়ক-নায়িকার পরিবর্তে কোনো গৌণ চরিত্র সজীব ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই শেষোক্ত প্রবণতার চমৎকার উদাহরণ 'নবীন সন্ন্যাসী'তে গদাই পালের চরিত্র। তাহার অদ্ভুত কৌশলজাল-বিস্তার ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা, তাহার অসাধারণ চক্রান্ত-নৈপুণ্য, নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন-দক্ষতা—এই সমস্তই তাহার চরিত্রকে প্রাণের বৈদ্যুতীশক্তিতে পূর্ণ করিয়াছে। কোনো উপন্যাসে লেখক তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতিকূলে অবিমিশ্র ট্রাজেডি রচনা করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

তাঁহার বড়ো উপন্যাসের মধ্যে 'রত্নদীপ ও 'সিন্দুরকৌটা' এই দুই-খানিকে প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে। 'রত্নদীপে' চমকপ্রদ, বিস্ময়কর সংঘটন আখ্যায়িকার ভিত্তিভূমি—পদচ্যুত স্টেশনমাস্টার রাখালের জাল

জমিদারপুত্র সাজিয়া জমিদারীলাভের অপচেষ্টা ইহার মুখ্য বিষয়। কিন্তু এই ঘটনাগত অসাধারণত্বকে ছাপাইয়া রাখালের মনে বিশুদ্ধ-প্রেমের সঞ্চার এবং বৌরাণীর কঠোর ব্রহ্মচর্যপূত জীবন, অবিচলিত পাতিব্রত্য পাঠকের চিত্তকে অভিভূত করে। বৌরাণীর চরিত্রের করুণ, বিষাদমণ্ডিত মাধুর্য ও অস্ত্যাজ্য সংস্কারে উন্নীত আদর্শনিষ্ঠার সহজ মহিমা, হিন্দু-বিধবার বাস্তব জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই, আমাদিগকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। খগেন ও কনক সম্পূর্ণ অন্য জগতের অধিবাসী—স্বার্থসিদ্ধি ও ভোগবিলাসে অসংযম ইহাদের জীবনের মূল প্রেরণা। তথাপি ইহারা লেখকের ক্ষমাস্নিগ্ধ সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য ইহাদের অসাধু নীতিপ্রয়োগকে লেখক কারুণ্যমণ্ডিত প্রশ্রয়ের চোখে দেখিয়াছেন। 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসে বিজয় ও সুশীর মধ্যে বাধ্যতামূলক সহচর্য সৌজন্য-শিষ্টাচার, বিপদে সহায়তা, সমবেদনা ও আশ্রয়দানের স্তর অতিক্রম করিয়া অনিবার্য প্রণয়োন্মেষে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রথম স্ত্রী বকুরাণীর নিরভিমান, ঈর্ষালেশবর্জিত নিষ্ক্রিয়তা তাহার চরিত্রের সুশীলতাকে যে পরিমাণে বাড়াইয়াছে, উপন্যাসের আকর্ষণকেও ঠিক সেই পরিমাণে কমাইয়াছে। পল সাহেবের নির্লজ্জ আত্মসম্মান-জ্ঞানহীনতা, স্ত্রীকে পণ্যদ্রব্যের ন্যায় ব্যবহার করিবার হেয় প্রবৃত্তিও লেখকের ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে নাই—এই ঘৃণ্যতম আচরণকেও তিনি ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। এই দুইটি উপন্যাসে বড়ো উপন্যাস রচনাতেও লেখকের যে উচ্চতর সম্ভাবনার অসদ্ভাব ছিল না, তাহার প্রমাণ মিলে।

প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রভাতকুমারের স্থান নাই। তাঁহার পরিধির সংকীর্ণতা, বিশ্লেষণ-গভীরতার অভাব, জটিল ও জীবনের মূল পর্যন্ত প্রসারিত ভাব-সংঘাতের পরিহার ইত্যাদি কারণই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পথে অন্তরায়। কিন্তু তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা এক-দিকে সম্পূর্ণ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি; অন্যদিকে হাস্যকৌতুকে সরস, শালীনতায় ও পরিমিতি-বোধে শোভন, সুকুমার হৃদয়বৃত্তির অনু-শীলনে স্নিগ্ধ। তাঁহার ছোটগল্পগুলি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের সমস্যামুক্ত সুখস্বাচ্ছন্দে স্বতঃস্ফূর্ত ও তৃপ্ত, যৌবনসুলভ স্বপ্নাবেশে মুগ্ধ ও বাস্তবের সস্নেহ অনুযোগে ও সকৌতুক কটাক্ষে মৃদু বিড়ম্বিত বাঙালী-জীবনের চমৎকার রৌপ্যোজ্জ্বল আলোক।

সপ্তম অধ্যায়

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের আকস্মিকতা ও তাঁহার প্রবর্তিত রীতির বৈপ্লবিক অভিনবত্ব, উভয়ই চমকপ্রদ। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য তাঁহার উপন্যাসকে অনন্যসাধারণতার ছাপ দিয়াছে—ইহার কল্পনাপ্রধান সৌন্দর্যসুষমা সাধারণ ঔপন্যাসিকের অননুকরণীয়। এই কারণে উপন্যাসের অগ্রগতি যখন রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছিল, তখন শরৎচন্দ্র অতর্কিতভাবে অবতীর্ণ হইয়া এক বিপুল সীমাহীন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। নিষিদ্ধ প্রেমের বিশ্লেষণে, সামাজিক রীতিনীতির তীক্ষ্ণ চিন্তাশীল সমালোচনায়, সমাজশাসনে নির্যাতিত হতভাগ্যদের প্রতি গভীর করুণ সমবেদনায় তিনি আমাদের উপন্যাসের পরিধিকে সুদূরপ্রসারিত করিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার হাতে উপন্যাস নূতন গতিবেগ ও জীবনীশক্তি আহরণ করিয়া আবার পূর্ণযৌবনের স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস অসাধারণ ব্যক্তি ও তাহাদের অসাধারণ সমস্যার আলোচনায় সীমাবদ্ধ; সমাজ ও পরিবারের সহিত ইহাদের সংযোগ অতি শিথিল। শরৎচন্দ্রের কারবার আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রস্থ সমস্যা লইয়া। তাঁহার সৃষ্ট নরনারী এই অতিবাস্তব আবেষ্টনের মধ্যে কোথাও বা অসহায় আত্মসমর্পণে, কোথাও বা নির্ভীক বিদ্রোহে, আপন আপন সংঘাতক্ষুব্ধ জীবনের পরিণতির ইতিহাস রচনা

করিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর সমাজের নিয়ন্ত্রণাধিকারের সীমা পরিবারের মধ্যে চরিত্র-বিভেদ ও আদর্শ-সংঘাতের ফলে জটিল অন্ত-র্বিপ্লব, প্রেমের প্রকৃতিরহস্য ও সামাজিক বাধানিষেধের বিরুদ্ধে ইহার বিচিত্র বিক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া, সমাজ-জীবনে নারীর দৃপ্ত স্বাতন্ত্র্যঘোষণা ও নিগূঢ় প্রভাব—এই সমস্তই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বাঙালীর নির্জীব, গতানুগতিক, কঠোর নিয়মনিয়ন্ত্রিত জীবনে তিনি এক নূতন শক্তির স্ফুরণ, এক নূতন আদর্শের বিদ্রোহাত্মক প্রেরণা, এক নূতন অনুভূতির তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ আবিষ্কার করিয়া ইহাকে এক অভূতপূর্ব অর্থগৌরব ও রসসমৃদ্ধির দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছেন। ইহার নিস্পন্দ, অসাড় মৃতদেহে এক নূতন ভাব ও চিন্তার বৈদ্যুতীশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। জীবনের শুষ্ক ঊষর মৃত্তিকার নিম্নে এক অফুরন্ত রসনির্ঝরের সন্ধান দিয়া তিনি জীবনের মূল্য ও উপন্যাসের ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা উভয়কেই আশ্চর্যরূপে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন ইহা যেমন সত্য, সেইরূপ তিনি পুরাতন ধারার সহিত সংযোগহীন নহেন ইহাও তেমনই সত্য। বস্তুতঃ 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' ও 'শ্রীকান্ত' ছাড়া অন্যান্য উপন্যাসে তিনি উপন্যাসের সনাতন ধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন। এই সমস্ত উপন্যাসে প্রধানতঃ একান্নবর্তী পরিবারের ক্ষুদ্র বিরোধকাহিনীই চিত্রিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রেমের স্থান নিতান্ত গৌণ। ইহাদের মধ্যে কয়েকটিতে প্রেমের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা সামাজিক প্রথার বিরোধী নহে। প্রেমের দুর্দমনীয়,

সমাজবিধ্বংসী প্রভাবের কোনো চিহ্ন এখানে মিলে না। কাজেই শরৎচন্দ্র উপন্যাসের পূর্ব ইতিহাসের সহিত যে সম্পর্কান্বিত তাহার প্রমাণ এই সমস্ত রচনায় মিলে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পারিবারিক বিরোধের চিত্রে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক। স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার বক্র, তির্যক গতি, সমাজনির্দিষ্ট পথ উপেক্ষা করিয়া হৃদয়াবেগের অপ্রত্যাশিত প্রণালীর অনুসরণ—যাহা রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা' 'ব্যবধান' 'রাসমণির ছেলে' প্রভৃতি গল্পে উদাহৃত হইয়াছে—শরৎচন্দ্রের গল্পের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ তথ্যসন্নিবেশ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ অপেক্ষা সমস্যার সাধারণ নির্দেশ ও ইহার কাব্য-সৌন্দর্যময় অভিব্যক্তির প্রতি অধিক মনোযোগী। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও ঘাতপ্রতিঘাতের তীক্ষ্ণতা অধিকতর পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথ যে সংঘাত কাব্যসুষমার যবনিকান্তরালে অর্ধ-প্রচ্ছন্ন রাখেন, শরৎচন্দ্র তাহা অনাবৃত প্রকাশ্যতার মধ্যে টানিয়া আনিয়া ইহার ভাবাবেগ ও চরিত্রাভিব্যক্তির দিকটা মনের উপর গভীর, অবিস্মরণীয় রেখায় মুদ্রিত করিয়া দেন। এই বিরোধচিত্র-গুলিতে মনোমালিন্যের দায়িত্ব তিনি যথাসম্ভব অপক্ষপাত দৃষ্টির সহিত বিবদমান উভয় পক্ষের মধ্যেই ভাগ করিয়া দিয়া বিরোধের জটিলতা ও স্বাভাবিকত্ব বাড়াইয়া তোলেন; উদ্দেশ্যের মহত্ত্বের সহিত বাহ্যকর্কশতা ও তীব্র অসহিষ্ণুতা যোগ করিয়া স্বার্থপর অপর পক্ষের আচরণের দূষণীয়তা অনেকটা লঘু ও সহনীয় করেন।

শরৎচন্দ্রের শিক্ষানবিশি হাতের রচনার মধ্যে তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'শুভদা' (২০ জুন—২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) একমাত্র উদাহরণ। বাকি সমস্ত রচনার মধ্যে উৎকর্ষের তারতম্য সত্ত্বেও, পরিণত শক্তি ও জীবন সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট, অনুশীলিত (disciplined) দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলে। 'শুভদা' কাঁচা হাতের লেখা ইহা বুঝা গেলেও ইহার মধ্যে শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাষের অভাব নাই। বিন্দুর তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্যবোধ, রাসমণির অভিশাপের মধ্য দিয়া উদ্বেলিত ভ্রাতৃস্নেহ, গণিকা কাত্যায়নীর প্রতি লেখকের সহানুভূতি ও ললনার বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনের অনুচ্চারিত সমর্থন—এই সমস্তই তাঁহার পরিণত রচনাভঙ্গী ও মনোভাবের সূচনা। শুভদার অটুট ধৈর্য ও মূক সহনশীলতা মানুষ অপেক্ষা জড়পদার্থের ভয়াবহ অপরিবর্তনীয়তার সহিতই অধিকতর সাদৃশ্যবিশিষ্ট।

'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি', 'মামলার ফল', 'একাদশী বৈরাগী', 'নিষ্কৃতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল' প্রভৃতি গল্প প্রেমবর্জিত সাধারণ পারিবারিক জীবনের কাহিনী। ইহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের দুইটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—প্রথম, জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অথচ স্নেহ ও সমবেদনায় কোমল নারীচরিত্র সৃষ্টি; দ্বিতীয়, ছোটখাট পারিবারিক সংঘর্ষের ভিতর দিয়া হৃদয়বৃত্তির বক্র, বিপরীতমুখী গতিবিধির দৃষ্টান্তসমাবেশ—কৌতূহলোদ্দীপক, অভিনব মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ। বিন্দু, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী, শৈলজা—ইহারা

সকলেই তীব্রইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, পরিবারের বৈষম্যমূলক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদতৎপর, স্নেহশীলতার মধ্যেও প্রশ্রয়হীন ও ন্যায়নিষ্ঠ গৃহিণীর উদাহরণ। যে পারিবারিক শান্তি ও ঐক্য অসাড়-বশ্যতা ও আত্মসম্মানহীন তোষামোদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা ইহাদের তেজস্বী অন্যায়-অসহিষ্ণু ব্যবহারে রূঢ়ভাবে বিচলিত হইয়াছে। ইহারা ঘর ভাঙিয়া, চিরপ্রথাগত আচরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া সমাজে নিন্দাভাজন হইয়াছে, কিন্তু আমাদের দুর্নীতিপূর্ণ, জড় পরিবারব্যবস্থায় নূতন প্রাণ-হিল্লোল ও উন্নততর নীতিবোধের প্রবর্তন করিয়াছে। আবার এই নারীদের মধ্যে স্নেহভালোবাসা এক উৎকট আতিশয্যের সহিত ও অনভ্যস্ত অভিনব বেশে আত্মপ্রকাশ করিয়া সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে বিপরীত স্রোতোধারা বহাইয়াছে। পুরুষদের মধ্যেও একাদশী বৈরাগী ও 'বৈকুণ্ঠের উইলে' গোকুল তাহাদের চরিত্রের অপ্রত্যাশিত দিক উদ্‌ঘাটিত করিয়া আমাদের মানবচরিত্রজ্ঞানের পূর্বধারণার বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। সুদখোরের মধ্যে মহত্ত্বের বীজ, খামখেয়ালী অস্থিরমতিত্ব ও বাহ্য কর্কশতার মধ্যে অসম্বরণীয় স্নেহোচ্ছ্বাস আমাদিগকে চমকিত করিয়া মানবচরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা ও ইহাতে বিসদৃশ উপাদানের সমাবেশশীলতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আর কতকগুলি গল্প-উপন্যাসে প্রেমের সাধারণ, সমাজানুবর্তী দিকটা আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রেমের যে বিশ্লেষণ আছে, তাহাতে বিদ্রোহ নাই, আছে স্বাধীনচিত্ততা ও ইহার আকর্ষণ-বিকর্ষণ, জোয়ার-ভাটার প্রতি খুব সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। 'দেবদাস', 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিত মশাই', 'স্বামী', 'নববিধান' প্রভৃতি

পর্যায়ভুক্ত। 'দেবদাসে' পার্বতীর বাল্যপ্রণয় লৌকিক কর্তব্যচ্যুত না হইয়াও ইহার দাবি ও ভাবাবেগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে; সামাজিক রীতি অনুসারে যে নিঃসম্পর্ক, পরিবারমণ্ডলীর মধ্যে তাহার জন্য একটি স্নেহ-শীতল আসন নির্দিষ্ট করিয়াছে। গণিকার প্রেমের মধ্যে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও নিষ্কলুষ বিশুদ্ধির আবিষ্কারও লেখকের পরিণত মনো-ভাবের ইঙ্গিত বহন করে। 'বড়দিদি' গল্পে মাধবীর প্রতি আত্মভোলা সুরেনের অসহায় নির্ভর উভয়ের মধ্যে যে স্নেহসম্পর্ক রচনা করিয়াছে তাহা কতক পরিমাণে প্রেমের লক্ষণবিশিষ্ট।

'চন্দ্রনাথ' গল্পে সামাজিক বাধার উপর প্রেমের জয় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই জয়ের কৃতিত্ব প্রেমিকের নহে, মনিশঙ্করের মধ্যে অভিব্যক্ত সমাজের উদার সহানুভূতির। কিন্তু গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ কৈলাস খুড়া। তাহার চরিত্রে দৃপ্ত পৌরুষ ও নির্বিরোধী সরলতার সহিত পরের ছেলের প্রতি করুন, মর্মান্তিক মায়ার চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। 'পরিণীতা' গল্পে প্রেমের অকুণ্ঠিত মহিমা ললিতার বাহ্য-অনুষ্ঠানহীন, সমাজের অনুমোদনরহিত মানস পতি-বরণের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠার দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য শেখর-ললিতার সম্বন্ধটির জন্য উপযুক্ত প্রতিবেশ রচনা করিতে লেখককে প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার আদর্শকে অস্বাভাবিক রূপে উচ্চ করিতে হইয়াছে। শেখরের মধ্যে এক অর্থ সম্বন্ধে উদারতা ছাড়া অন্য কোনো বরণীয় গুণের একান্ত অভাব ললিতার প্রেমের মহিমাকে আরও বরেণ্য করিয়াছে।

'পণ্ডিতমশাই' গল্পটিতে লেখক বৈরাগীজাতির মধ্যে সমাজ-

বাধামুক্ত প্রণয়লীলার যে প্রচুরতর অবসর আছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু কুসুম, বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনের মাতা—এই তিনজনের চরিত্রে এত সূক্ষ্ম অনুভূতি, মান-অপমান-বোধ, মার্জিত ভদ্র আচরণ ও সংস্কার ও অবিচলিত আদর্শনিষ্ঠা আরোপিত হইয়াছে যে, তাহাতে তাহাদের সামাজিক বাস্তব পরিচয় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের তুলনায় কুঞ্জনাথ ও তাহার শাশুড়ী তাহাদের স্থূল অমার্জিত মনোবৃত্তি লইয়া যেন ভিন্ন জগতের অধিবাসী। বৃন্দাবনের প্রতি কুসুমের ভালোবাসার প্রসার-সংকোচ, উদ্দীপন-অবসাদের স্তরগুলি খুব চমৎকারভাবে দেখানো হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাত বর্ণনায়, ও বিশেষতঃ বৃন্দাবনের চরিত্র কল্পনায়, বৈরাগীজীবনের বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। কুঞ্জনাথের স্থূলবুদ্ধি ও শ্বশুর-বাড়ির সংস্পর্শজাত উগ্র আভিজাত্যগৌরবের মধ্যে ভগ্নীস্নেহের এক অতর্কিত ঝলক মানবচিত্তরহস্যের আর-এক প্রমাণ। 'স্বামী' গল্পে অবৈধ প্রণয়ের উপর দাম্পত্যপ্রেমের জয় বর্ণিত হইয়াছে। স্বামীর ক্ষমাশীলতা ও ধর্মবিশ্বাস এখানে অন্যাসক্তা স্ত্রীর বিমুখতা জয় করিয়াছে। 'নববিধানে' হিন্দু স্ত্রীর আচারনিষ্ঠতা, পাতিব্রত্য ও গৃহিণীপনা কেমন করিয়া পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, দুর্বলচেতা স্বামীকে পরিবারমণ্ডলীর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তাহার প্রতি নির্ভরশীল করিল তাহারই কাহিনী। এখানে প্রেমের কোনো আভাস নাই—সংসার পরিচালনায় নারীর কৃতিত্ব ও তাহার তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানজ্ঞানই তাহার স্বামীর সংসারে প্রতিষ্ঠালাভের কারণ। এই সমস্ত উপন্যাসে প্রেম অপেক্ষা নারীচরিত্রের মহিমাই লেখকের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

প্রেমের আলোচনায় লেখকের উদার, সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাইলেও সমাজবিধির বিরুদ্ধে তাঁহার কোনো বিদ্রোহ নাই।

৩

'বামুনের মেয়ে', 'অরক্ষণীয়া' ও 'পল্লীসমাজ' এই তিনটি উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজ-সমালোচনা। শরৎচন্দ্রের সমাজ-সমালোচনায় মর্মভেদী তীক্ষ্ণতা ও গভীর সমবেদনার চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। সমাজের বিকৃতি ও ক্ষত সমূহের মধ্যে লেখক বিশ্লেষণের ছুরিকা এরূপ অভ্রান্ত ব্যবচ্ছেদকৌশলের সহিত চালাইয়াছেন যে, আমাদের বিবেকবুদ্ধি এই নির্মম আঘাতে গভীরভাবে বিচলিত হয়—কোনো সুলভ সান্ত্বনা ও দোষক্ষালনের প্রলেপে ইহার মর্মজ্বালা প্রশমিত হয় না। সমাজের মূঢ় অত্যাচারে লেখকের সুগভীর বেদনাবোধ তাঁহার আঘাতের অসহনীয় তীব্রতাকে কারুণ্য-রসে অভিষিক্ত করিয়াছে। বৈদেশিক সমালোচকের অক্ষম ও শ্লেষ-প্রধান আক্রমণ আমাদের প্রতিঘাতপ্রবৃত্তিকে জাগরিত করে; শরৎ-চন্দ্রের অব্যর্থ শরসন্ধান, আন্তরিক কল্যাণকামনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া, আমাদিগকে নিরুত্তর আত্মগ্লানিতে একেবারে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে। সামাজিক অন্ধসংস্কারের বিষ আমাদের অস্থিমজ্জাতে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের বিধাতৃনির্দিষ্ট দুঃখের বোঝা কি ভয়াবহরূপে বাড়াইয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে কিরূপ দুর্বিষহ ও আমাদের স্নেহ-প্রীতির বিশুদ্ধ উৎসকে কিরূপ বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তাহা মর্মান্তিকরূপে সুস্পষ্ট হইয়াছে। এই উপন্যাসগুলি উদ্দেশ্যমূলক হইলেও লেখকের সংযম ও ভাবাবেগের গভীরতা

ইহাদিগকে উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের আপেক্ষিক অপকর্ষপ্রবণতা হইতে রক্ষা করিয়াছে।

'অরক্ষণীয়া'তে লেখক দেখাইয়াছেন যে, বিবাহব্যাপারে সমাজ-বিধির মূঢ়যান্ত্রিকতা মাতৃস্নেহকে পর্যন্ত অভিভূত করিয়া মাতার হাত হইতে অবিবাহিত কন্যার চরম অপমান ঘটায়। আত্মীয়স্বজনের নিঃস্নেহ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অবিশ্রান্ত খোঁচা বিবাহ-বাজারে অমনোনীতা কুরূপা জ্ঞানদার উপর বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার নরকভয়ভীত মাতার পদাঘাত ও তাহার স্বহস্তরচিত লাঞ্ছিত প্রসাধনচেষ্টা তাহাকে অপমানের চরম গ্লানি অনুভব করাইয়াছে। এমনকি, স্বয়ং লেখক পর্যন্ত কৃতঘ্ন প্রেমিক অতুলের সহিত তাহার পুনর্মিলনের ইঙ্গিত করিয়া সমবেদনার ছদ্মবেশে এই দুর্ভাগিনী মেয়েটার বক্ষে আর-একটা দুঃসহ অপমানের শেলাঘাত করিয়াছেন। আমাদের সমাজে বিবাহের উৎসব-সমারোহ ও আনন্দোচ্ছ্বাসের পিছনে কি সুগভীর বেদনা ও মনুষ্যত্বের কি দুঃসহ অপমান পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে এই উপন্যাসে সেই শোচনীয় কাহিনী মর্মভেদী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

'বামুনের মেয়ে'তে কৌলীন্যগৌরবের হাস্যকর অসংগতি ও শূন্য-গর্ভতার প্রতি লেখকের শ্লেষ প্রযুক্ত হইয়াছে। কৌলীন্যপ্রথার কুফল সমাজে এখন আর সক্রিয় নাই বলিয়াই এ আক্রমণে তীব্রতা অপেক্ষা হাস্যকরতাই অধিক। এই বিলুপ্তপ্রায় প্রথার পটভূমিকাতে লেখক একদিকে অরুণ ও সন্ধ্যার প্রতিহত প্রণয়লীলা, অন্যদিকে সমাজপতি গোলোক চ্যাটুজ্যের যথেচ্ছাচার ও অব্যাহত ইন্দ্রিয়াসক্তির চিত্র আঁকিয়াছেন। সন্ধ্যা-অরুণের প্রেম ও সন্ধ্যার তেজস্বিতা ভালো

ফোটে নাই। পক্ষান্তরে অপ্রধান চরিত্রগুলি—গোলোক, রাসু বামনি, জগদ্ধাত্রী ও প্রিয় মুখুজ্জ্যে—বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সমাজ-সমালোচনাবিষয়ক উপন্যাসের মধ্যে 'পল্লীসমাজ' সত্যানুবর্তন, বিশ্লেষণের নির্মমতা ও ভাবগভীরতার প্রাধান্য দাবি করিতে পারে। পল্লীসমাজে সামাজিক দলাদলির প্রভাবে হেয় কাপুরুষতা কিরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, সমস্ত উচ্চ প্রবৃত্তি ও আদর্শ কিরূপে অধঃপতিত হইয়াছে, সাধারণ জীবনযাত্রা কিরূপ রুগ্ন ও বিকৃত হইয়াছে তাহা আগুনের অক্ষরে এই উপন্যাসে মূর্ত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসটির দ্বারা পল্লীসমাজের কদর্য প্রাণহীনতা সম্বন্ধে আমাদের সুপ্ত বিবেকবুদ্ধিকে যেরূপ তীক্ষ্ণভাবে জাগ্রত করিয়াছেন তাহা তাঁহার আলোচনা-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন ও সাফল্যের মানদণ্ড।

পল্লীসমাজের চিত্রে যাহা সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক তাহা পল্লীবাসীদের দ্বারা রমেশের শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত আদর্শবাদের অস্বীকার ও বেণী ও গোবিন্দ গাঙ্গুলির ক্রূর বৈষয়িক বুদ্ধির সমর্থন। ভৈরব আচার্য গ্রামবাসীর এই হেয় মনোবৃত্তির খাঁটি প্রতিনিধি। এই কৃতঘ্নতা, মহৎ ব্যক্তির উদারতার হীন সুযোগ লইয়া তাহার বিরুদ্ধপক্ষে যোগদান, তাহারই অস্ত্রাগার হইতে তাহার বক্ষে হানিবার অস্ত্র সংগ্রহ, গ্রাম্যজীবনের হীনতম কলঙ্ক। এই আত্মঘাতী নীতির ফলে গ্রামের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ, সহানুভূতির উৎসমুখ পর্যন্ত প্রতিরুদ্ধ হয়। সমাজব্যাপী বিকৃতির মধ্যে কয়েকটি মাত্র সুস্থ উপাদান দেখা যায়—দীনু ভট্টাচার্যের সরল অকুণ্ঠিত দারিদ্র্যস্বীকার, আকবরের গ্লানিহীন বলিষ্ঠ পরাজয়-বরণ, পীরপুরের মুসলমান প্রজার সবল প্রতিরোধোদ্যম

রমেশের জেলের পর গ্রামের কৃষকদের নির্ভীক অসহযোগ। এই সতেজ অণুগুলিকে কেন্দ্র করিয়া আবার নূতন সুস্থ সমাজ গড়িয়া উঠিবে এই আশার ইঙ্গিত গ্রন্থ হইতে আহরণ করা যায়।•

বিশ্বেশ্বরী রমেশের উচ্চভাবপ্রধান আদর্শের সঙ্গে পল্লীজীবনের বিড়ম্বিত বাস্তব অবস্থার মধ্যস্থতা করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মুখে আমরা যে-সমস্ত জ্ঞানগর্ভ, ক্ষমা ও সহানুভূতির সমর্থক বাণী শুনিতে পাই, তাহার উৎস আমাদের নিকট অনাবিষ্কৃতই থাকে। তাঁহার প্রভাব বেণীর উপর একেবারে নিষ্ফল ও যাহার সহিত তাঁহার সত্যিকার স্নেহসম্পর্ক ছিল সেই রমার উপরও অত্যন্ত মৃদুভাবে কার্যকরী হইয়াছে। উপন্যাসে তাঁহার সক্রিয় অংশও খুব কম—তিনি অধিকাংশ স্থলেই অন্তরালবর্তিনী রহিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহার চরিত্র অনেকটা অবাস্তব হইয়াছে। 'গোরা'র আনন্দময়ীর সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁহার জীবনে আনন্দময়ীর অভিজ্ঞতা-বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ কিছু মিলে না।

এই পল্লীসমাজ কেবলমাত্র আদর্শবাদ ও স্বার্থবুদ্ধির দ্বন্দ্বক্ষেত্র নহে, ইহা একটি নিগূঢ়, জটিল, অর্ধসচেতন প্রেমলীলার রঙ্গমঞ্চ। ইহার স্থূল স্বার্থসংঘাতের উপর যে মহিমা ও ভাবগভীরতা আরোপিত হইয়াছে, তাহার উৎস রমেশ ও রমার পরস্পরের প্রতি অস্বীকৃত প্রণয়াবেগ। পল্লীর রাজনীতিক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই গোপন হৃদয়াবেগের অপরিচিত আকর্ষণে এত জটিল, দ্বিধাসংকুল ও বেদনাজড়িত হইয়া উঠিয়াছে। রমার সমস্ত দৃঢ়সংকল্প ও বিষয়বুদ্ধির

পিছনে এই রহস্যাচ্ছন্ন মোহাবেশ অনিচ্ছা ও অনুশোচনার ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রমেশের চরিত্রগৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা ও হিত-কামনার অন্তরালে প্রেমেরই অসংবরণীয় আবেগ অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হইয়াছে। তারকেশ্বরে একরাত্রি সেবাযত্নের মধ্যে এই প্রেম মুহূর্তের জন্য নিজ অবগুণ্ঠন মোচন করিয়াছিল—ইহারই ব্যর্থতার অসহনীয় জ্বালার মধ্যে রমার পল্লীজীবনের নেতৃত্ব হইতে অবসরগ্রহণ এত করুণ ও অশ্রুভারাকুল হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীজীবনের তুচ্ছ বৈষয়িক বিরোধের উপর শরৎচন্দ্রের প্রতিভা অন্তরবেদনার বিষাদ-গম্ভীর মহিমা আরোপ করিয়াছে।

৪

'দেনা-পাওনা' ও 'দত্তা' এই দুইটি উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সাধারণ নির্দোষ প্রেমের চিত্র আঁকিয়াছেন। 'দেনা-পাওনা'তে ষোড়শীর প্রতি জীবানন্দের অকস্মাৎ উন্মেষিত আকর্ষণ দৈবক্রমেই পরস্ত্রী-অনুসরণের কলুষমুক্ত হইয়াছে। ষোড়শী জীবানন্দের বিবাহিতা পরিত্যক্তা স্ত্রী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং যদিও সমাজবিধি অনুসারে ষোড়শীর প্রসাদভিক্ষা জীবানন্দের দাম্পত্য-অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াস মাত্র, কিন্তু বাস্তবিকই এই প্রণয়ব্যাপারে পরকীয়া প্রীতির সমস্ত আবেগ ও দ্বিধাগ্রস্ত মর্মবেদনা সঞ্চারিত হইয়াছে। শেষে যখন জীবানন্দ ষোড়শীকে নিজের স্ত্রী বলিয়া চিনিয়াছে, তখন তাহার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা সমাজ-সমর্থন ও পাঠকের সহানুভূতি লাভ করিয়া আরও মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই প্রেমকাহিনীকে নিষিদ্ধ প্রেমের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করিতে কোনো বাধা নাই।

এই উপন্যাসটির বিশেষ আকর্ষণ ইহার পটভূমিকার অসাধারণত্বে। দেবী-মন্দিরের যে ভৈরবী জীবনে ধর্মসাধনার অন্তরালে প্রায় প্রকাশ্য পাপাচরণ সমাজের পরোক্ষ সমর্থন লাভ করিয়া থাকে, ষোড়শী সেই ধর্ম ও ভোগলালসা মিশ্র আবিল আবহাওয়ার মধ্যে সহজ নেতৃত্বশক্তি অর্জন করিয়াছে ও চরিত্রগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহার এই অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যের জন্যই সে জীবানন্দের অদ্ভুত প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া নিজ চরিত্রে কলঙ্কস্পর্শসম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে ও সমস্ত সমাজের সম্মিলিত বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইবার সাহস পাইয়াছে। জীবানন্দের সহিত তাহার সম্বন্ধের পরিবর্তন স্তর-গুলি, কঠোর প্রত্যাখান ও কোমল আত্মসমর্পণের দ্বৈতভাব পর্যায়টি, আশ্চর্য কলাকৌশল ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে মন্দির ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাসে আত্মগোপন করিয়াছে—সমাজের ভয়ে নহে, নিজ অন্তর্দ্বন্দ্ববিক্ষত হৃদয়ের শান্তির জন্য। উচ্ছৃঙ্খল, লজ্জাসংকোচহীন জীবানন্দের চরিত্র প্রণয়ের এই অনভ্যস্ত অনুভূতিতে ব্যথায় কোমল, সমবেদনায় প্রসারিত ও মহত্ত্বে উন্মেষিত হইয়াছে। জীবানন্দ ও ষোড়শী উভয়েরই চরিত্র ও গ্রাম্যসমাজের কুৎসিত স্বার্থান্ধতার ছবি লেখকের ঔপন্যাসিক শক্তির চমৎকার উদাহরণ।

'দত্তা' উপন্যাসে নির্দোষ প্রেমের উপভোগ্য চিত্র দেওয়া হইয়াছে। নানা বিরুদ্ধশক্তির মধ্যে, প্রতিকূল অবস্থা, পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা এমনকি বাগ্‌দানের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা অতিক্রম করিয়া, এখানে প্রেম নিজের পথ করিয়া লইয়াছে। নরেন ও বিজয়ার মধ্যে নানা

ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া প্রেমের উদ্ভব ও ইহার ক্রম-বর্ধমান প্রভাবের কাহিনীটি চমৎকার হইয়াছে। নরেনের আত্ম-ভোলা উদাস প্রকৃতিটি এই প্রণয়োন্মেষের সম্ভাবনা সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ ছিল বলিয়া ইহার প্রকাশ্য আবির্ভাব আরও চমকপ্রদ ও নাটকীয় গুণোপেত হইয়াছে। রাসবিহারীর চরিত্র লেখকের সৃষ্টি-শক্তির চরম উৎকর্ষের উদাহরণ—বিনয়সৌজন্যপূর্ণ হিতৈষণার অন্তরালে তাহার ক্ষুরবুদ্ধি বৈষয়িকতা ও শেষ মুহূর্তে তাহার ভণ্ডামির মুখোসখোলা উৎকট স্বার্থপরতার অভিব্যক্তি সূক্ষ্ম কলা-কৌশলে যে-কোনো ঔপন্যাসিকের সৃষ্টির সহিত সমকক্ষতার দাবি করিতে পারে। বিলাসের চরিত্র নিদারুণ আশাভঙ্গের পর অনেকটা নিঃস্বার্থ মহত্ত্বের গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম হাস্যপরিহাস, নিপুণ ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টির সুসংগতি ও মনস্তত্ত্বকুশলতা ও প্রেমের নিগূঢ় রহস্যের বিশ্লেষণে উপন্যাসটি একেবারে উন্নত কলা-কৌশল ও চিত্তাকর্ষক উপভোগ্যতা এই উভয় গুণেই সমৃদ্ধ হইয়াছে।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসে গোঁড়া আচারনিষ্ঠ মুখুজ্যে-পরিবারের সংস্পর্শে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শে অভ্যস্তা বন্দনার হৃদয়ে কিরূপ আলোড়ন জাগিয়াছে তাহার বর্ণনা মোটের উপর সুসংগত ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তাহার ব্যঙ্গাত্মক মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ও সাময়িক বিদ্রোহের ভিতর দিয়া এই নূতন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হইয়াছে; তবে বন্দনার প্রণয়াস্পদের পরিবর্তন একটু মাত্রাতিরিক্ত দ্রুততার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। দ্বিজদাসের প্রতি তাহার আকর্ষণ স্বাভাবিক—অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র বিনয়ের

প্রতি ললিতার মনোভাবের অনুরূপ। তাহার পূর্ব প্রণয়ী সুধীর ও সর্বশেষে নির্বাচিত অশোকের প্রতি বিরাগ ও বিমুখতাও তাহার দৃষ্টি-ভঙ্গী পরিবর্তনের আলোকে সহজবোধ্য। কিন্তু বিপ্রদাসের প্রতি তাহার হৃদয়সমর্পণ আকস্মিকতা ও খামখেয়ালির চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে মনে হয়। লেখক ইহার কোনো ব্যাখ্যা দেন নাই—বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুগম্ভীর প্রকৃতি ভগ্নীপতির প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রণয়ে রূপান্তরিত হইতে যে প্রবল হৃদয়াবেগ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রয়োজন গ্রন্থে তাহার কোনো আভাস নাই। হয়ত বিপ্রদাসের দাম্পত্যজীবনের শূন্যতা, তাহার একান্ত নিঃসঙ্গতা বন্দনার মনে সমবেদনার মধ্যবর্তিতায় ক্ষণিকের মোহাবেশের সঞ্চার করিয়া থাকিবে। কিন্তু বন্দনার চরিত্র-বিচার পক্ষে তাহার এই মানস আবির্ভাব এত প্রয়োজনীয় যে এ সম্বন্ধে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করা চলে না। বিপ্রদাসের মহত্ত্ব অনেকটা অপরের ভক্তি মোহ ও প্রশংসাপত্রের উপর নির্ভরশীল—তাহার খ্যাতির অনুরূপ মহত্ত্বের প্রমাণ তাহার আচরণে মিলে না। দয়াময়ীর চরিত্রগৌরব আরও স্পর্শ-অসহিষ্ণু—ইহার একমাত্র প্রমাণ তাহার সপত্নী-পুত্রের প্রতি স্নেহশীলতায়। তাহার সংকীর্ণ, মোহান্ধ আচার-নিষ্ঠা ও আভিজাত্যগৌরব সামান্য সৌজন্য ও আতিথেয়তার পরীক্ষায় বার বার নিজ শূন্যগর্ভতার পরিচয় দিয়াছে। তুচ্ছ কারণে মাতাপুত্রের মর্মান্তিক বিচ্ছেদ উভয়ের পক্ষেই অগৌরবজনক ও উভয়েরই খ্যাতির অন্তঃসারশূন্যতার প্রমাণ। এক দ্বিজদাসই গ্রন্থমধ্যে সজীব চরিত্র, তবে তাহার সাম্যবাদ অনেকটা পোশাকি পরিচ্ছদের মতো; গ্রন্থারম্ভে একবার পরাইয়া তাহা খুলিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার স্বাভাবিক

গৌরবের উপর এই ধার-করা অলংকার ঠিক মানানসই হয় নাই। মোটের উপর শরৎচন্দ্রের শেষজীবনে শক্তির যে ম্লানিমা দেখা যাইতেছিল, 'বিপ্রদাসে' সেই নিম্নাভিমুখিতা অনেকটা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের রচনায় যে তুমুল দেশব্যাপী বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার উৎস তাঁহার চারিখানি উপন্যাস—'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত' ও 'শেষ প্রশ্ন'। এই কয়েকখানি গ্রন্থেই অবৈধ, সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের সহানুভূতিমূলক আলোচনা করা হইয়াছে। প্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের সনাতন মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদজ্ঞাপন লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা প্রেমে একনিষ্ঠতা ও দৈহিক বিশুদ্ধিকেই অত্যধিক প্রাধান্য দিয়া থাকি। সতীত্বের জয়ঘোষণায় আমাদের কাব্যসাহিত্যও সাধারণ জনমত-মুখরিত। শরৎচন্দ্র নির্মম বিশ্লেষণসাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, এই অতি-প্রশংশিত সতীত্বের মূল্য চিরন্তন নহে, আপেক্ষিক; ইহার মর্যাদা নির্ভর করে অনেকটা বহির্ঘটনার আনুকূল্যে। হৃদয়হীন স্বামীর প্রতি ভালোবাসা পোষণ না করিয়া তাহার প্রতি একনিষ্ঠতা একটা নিষ্ফল আত্মনিপীড়ন মাত্র। অভয়া তাহার স্বামীর সহিত সম্পর্ক ছেদন করিয়া ও নূতন সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া সতীত্বের মিথ্যা অহংকার বিসর্জন দিয়াছে ও বিনিময়ে নিজ জীবনকে গ্লানিমুক্ত করিয়া শুধু ভোগে নহে কল্যাণ-বিকীরণে সার্থক করিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহাদিগকে অসতী বলিয়া সমাজ অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের মধ্যেও সতীত্বের মহিমা উজ্জ্বল হইয়া আছে। ইহাদের পদস্খলন একটা আকস্মিক বিভ্রম বা অপ্রতিবিধেয় দুর্ভাগ্য—ইহাদের মনের নির্মল শুভ্রতায় কলঙ্কস্পর্শ হয় নাই। সাবিত্রী

তাহার সমস্ত জীবনব্যাপী সংযম ও নিঃস্বার্থ আচরণ, অচলা তাহার অনির্বাণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অনুশোচনা, রাজলক্ষ্মী তাহার সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদা জ্ঞান ও হৃদয়ের সত্য প্রেরণার অকুণ্ঠ অনুসরণের দ্বারা তাহাদের প্রথম ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে ও সমাজের অনুমোদনই যে সতীত্বের প্রকৃত মূল্যনির্ধারণ নহে তাহা প্রমাণ করিয়াছে। কিরণময়ী ও কমল ইহাদের ঠিক সহোদরা নহে—সতীত্ব ইহাদের নিকট অত্যজ্য ধর্মের গৌরবমণ্ডিত নহে। ইহারা প্রেমের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া ইহার দুরবগাহ রহস্যের উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, প্রবৃত্তির বাস্তব রূপের সঙ্গে সমতা রাখিয়া ইহার ছন্দ নিয়মিত করিতে চাহিয়াছে, চিরন্তনতার পরিবর্তে ক্ষণিকবাদের, আবেগের পরিবর্তে বুদ্ধিবাদের দার্শনিক ভিত্তিতে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে খুঁজিয়াছে—একনিষ্ঠতা ও আত্মসংযমকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে নাই। ইহাদের বিপরীতধর্মী সুরবালা—সে প্রেমের পৌরাণিক আদর্শকে আধুনিক যুগের সংশয়-জড়িত, বাষ্প-কলুষ-স্পর্শ হইতে একেবারে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছে। এইরূপে সতীত্বধর্ম ও প্রেমের সম্বন্ধে নানা সূক্ষ্ম, বহুমুখী, গভীর চিন্তাশীল আলোচনার দ্বারা লেখক আমাদের জড়ধর্মী, অপরিবর্তনীয় ধারণার মধ্যে মৌলিক চিন্তা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তিত করিয়া উপন্যাস সাহিত্যে একটা যুগান্তরকারী পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন।

'গৃহদাহ' উপন্যাসের নামকরণে সাঙ্কেতিকতা ও তথ্যনির্দেশ উভয়ই বর্তমান। মহিমের পারিবারিক সুখ শান্তি নষ্ট হইয়াছে, ঘরও পুড়িয়াছে। প্রথমটির জন্য সুরেশের দায়িত্ব নিঃসন্দেহ, দ্বিতীয়টির জন্য তাহার দায়িত্ব অনেকটা অনুমানের বিষয়। অচলা এক অসংবৃত

ক্রোধের মুহূর্তে তাহার উপর ঘরপোড়ানর অভিযোগ আনিয়াছে সত্য, কিন্তু মনে হয় এ কার্য প্রতিবেশীর হিন্দুধর্ম সংরক্ষণে অত্যুৎসাহের ফল। মহিম যখন সহজেই অচলাকে সুরেশের সঙ্গে কলিকাতা আসিবার অনুমতি দিয়াছিল, তখন সুরেশের পক্ষে এই অপকার্যের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তাহার উপর এই দুষ্ক্রিয়া আরোপ করিলে তাহার চরিত্রকে অযথা হেয় করা হয়।

গ্রন্থ মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার—মহিম ও সুরেশের মধ্যে অচলার চলচ্চিত্ততা। মহিমের সহিত বাক্‌দান সম্পূর্ণ হইবার পর অচলার পিতার প্রশ্রয়প্রাপ্ত সুরেশের প্রেমনিবেদন অচলাকে নিশ্চয়ই কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত করিয়া থাকিবে, কেননা সুরেশের আকর্ষণীশক্তি মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। তথাপি অচলা প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দ্বারা এই অশোভন দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া মহিমের প্রতি অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। বিবাহের পর নিঃসঙ্গ পল্লীবাসে ও মহিমের নিঃস্নেহ ব্যবহারে তাহার মনে যে প্রবল প্রতিক্রিয়া জাগিয়াছে, তাহাই সুরেশের লোলুপতাকে নূতন ভাবে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। শুশ্রূষাক্লান্ত সুরেশের প্রতি প্রবাসজীবনের সঙ্গী হইবার আমন্ত্রণে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কোনো অস্বীকৃত প্রবলতর মোহ ছিল কি না তাহা অনিশ্চিত, কিন্তু অচলার পূর্ব ব্যবহারের সহিত মিলাইয়া সুরেশ এই ইঙ্গিতের যে অর্থ করিয়াছে, তাহাই তাহার চরম দুঃসাহসিকতার প্রেরণা যোগাইয়াছে। এই বাধ্যতামূলক সাহচর্যের ফলে সুরেশের প্রতি অচলার অনুরাগের শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপিয়া গিয়াছে। অবস্থা বৈগুণ্যে ও সম্ভ্রম রক্ষার মিথ্যা অভিমানে সে

সুরেশের নিকট দৈহিক বিশুদ্ধি বিসর্জন দিয়াছে, কিন্তু তাহার মনের সর্বাঙ্গীন বিমুখতা এক মুহূর্তের জন্যও তাহার দেহের এই আত্মসমর্পণের পোষকতা করে নাই। ডিহিরি প্রবাসের দিনগুলির উপর, সর্ববিধ ভোগায়োজনের অকৃপণ সমাবেশের মধ্যে, এক সর্বরিক্ত, ধূসর বৈরাগ্য, এক অসাড়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত নির্লিপ্ততার ছায়াপাত হইয়াছে। এই অধ্যায়গুলি একাধারে শরৎচন্দ্রের অনবদ্য কলাকৌশল ও অচলার অক্ষুণ্ণ মানস-সতীত্বের চরম নিদর্শন। সুরেশের নিশ্চিত মৃত্যুবরণও অচলার মনে যে ব্যাকুল উদ্‌বেগ জাগাইয়াছে, তাহার মূলে ভালোবাসা নাই, আছে নিজের একান্ত অসহায়তার উপলব্ধি। ডিহিরি জীবনের চিত্র আমাদিগকে টলষ্টয়ের অ্যানা কারেনিনার কথা মনে পড়াইয়া দেয়, কিন্তু অ্যানা অপেক্ষা অচলার মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতি আকর্ষণের ক্ষমতা অনেক বেশি। রেলগাড়িতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সুরেশ ও অচলার পরস্পরের প্রতি মর্মচ্ছেদী অস্ত্রাঘাত, শালীনতার সূক্ষ্মতম আবরণহীন নগ্ন সংঘর্ষ যেন বিদ্যুৎদীর্ণ, বর্ষণাকুল, মেঘমন্দ্রাভিভূত আকাশের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা।

অচলার এই কলঙ্কোজ্জ্বল, কঠোর পরীক্ষায় বিড়ম্বিত সতীত্বের সহিত মৃণালের সহজাত সংস্কারে উন্নীত, সেবা-আত্মত্যাগে মধুর, দাহদীপ্তিহীন একনিষ্ঠতার তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই তুলনা ঠিক ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। মৃণালকে অচলার মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। তাহার বৃদ্ধ স্বামী তাহার শুশ্রূষাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহার হৃদয়াবেগের প্রার্থী হয় নাই—কোনো বিরুদ্ধ আকর্ষণও তাহার মানসিক ভারসাম্যকে বিচলিত করে নাই। বাত্যা বিক্ষুব্ধ বেগবান নদীপ্রবাহের

সহিত শান্ত, নিস্তরঙ্গ, তটবন্ধনীতে সুরক্ষিত তড়াগের কি তুলনা সম্ভব? তা ছাড়া অচলার জীবন-নাট্য আমাদের সম্মুখে অভিনীত হইতেছে; মৃণালের ক্ষেত্রে অতীত আলোচনা প্রত্যক্ষ অভিনয়ের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কেদারবাবু ও রামবাবু উভয়ে পিতার সনাতন আদর্শের সঙ্গে নিজ নিজ বিশিষ্ট অপূর্ণতা ও অসহিষ্ণুতার ভেজাল মিশাইয়াছে। কেদারবাবুর রূঢ় সন্দেহপ্রবণতা ও ধনতৃষ্ণা মৃণালের প্রভাবে ক্ষমাস্নিগ্ধ ঔদার্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। রামবাবুর স্বাভাবিক উদার আতিথেয়তা অন্ধ ধর্মসংস্কারের কুমন্ত্রণায় হিংস্র, নির্মম বিরাগে পরিণত হইয়া নিজ ক্ষণভঙ্গুরত্ব ও শূন্যগর্ভতার পরিচয় দিয়াছে। গ্রন্থমধ্যে মহিমই প্রহেলিকা রহিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তরের যবনিকা এক মুহূর্তের জন্যও অপসারিত হয় নাই। অচলার প্রেম ও সুরেশের বন্ধুত্ব সে যে কি গুণে জয় করিয়াছে তাহা পাঠকের নিকট অজ্ঞাত। তাহার নির্বিকার ঔদাসীন্য ও নীরব আত্মকেন্দ্রিকতা বিশ্বাস্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। যেমন কোনো বিকৃত দর্শন দেবমূর্তি মন্দিরের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের সাহায্যেই নিজ দৈবী মহিমা বজায় রাখে, তেমনি মহিমও নিজ অন্ধকারাবৃত অন্তরলোকের অন্তরালে চরিত্র গৌরবের খ্যাতি লুক্কায়িত রাখিয়াছে। আলোক স্পর্শমাত্রই যে এই মিথ্যা মোহ কুহেলিকার ন্যায় মিলাইয়া যাইত তাহা নিঃসন্দেহ।

'গৃহদাহে' অচলার অনিচ্ছাকৃত ব্যভিচারের প্রতি অনির্বাণ অন্তর্দ্বন্দ্বের তুষানলের ব্যবস্থা করিয়া শরৎচন্দ্র অপরাধের প্রতি কিঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও মোটের উপর সতীত্বের সনাতন আদর্শের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহাতে অসতীত্বের দোষ লাঘব করা

হইয়াছে, ইহার মাহাত্ম্য খ্যাপন হয় নাই। 'চরিত্রহীনে' কিন্তু সনাতন আদর্শ একেবারে অক্ষত শূন্য হইয়া বিজয়লাভ করে নাই। এক-দিকে সাবিত্রী, অপরদিকে কিরণময়ী ইহার জ্যোতির্মণ্ডলের পিছনে যে অন্ধকার স্তর প্রচ্ছন্ন আছে তাহা উদ্ঘাটিত করিয়াছে। পতিতা উঞ্ছবৃত্তিধারিণী সাবিত্রীর চরিত্র লেখক এত উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন যে, সতীশ-সাবিত্রীর ভালোবাসার জয় প্রত্যেক পাঠকেরই কাম্য হইয়া উঠে ও যে-সমাজবিধি এই পরিপূর্ণ মিলনের অন্তরায় তাহার প্রতি মন ক্ষুব্ধ বিদ্রোহে ধূমায়িত হয়। সাবিত্রীর নিজের দীন আত্মগ্লানি, সামাজিক আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও প্রণয়াস্পদের অতন্দ্র কল্যাণকামনাই এই ঈপ্সিত পরিণতিকে প্রতিরোধ করিয়াছে। কিরণময়ী তীক্ষ্ণ যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রেম ও একনিষ্ঠতার ভিত্তিমূলকে খনন ও বিপর্যস্ত করিয়াছে। তাহার অন্তর্ভেদী মননশীলতা, জুগুপ্সিত আচরণ ও নির্মল প্রেমের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস ও সর্বোপরি এক চিত্ত-বিভ্রমকারী মোহিনী শক্তি আমাদের ধর্মাধর্মের বদ্ধমূল সংস্কারকে স্থায়ী ভাবে বিচলিত করে। 'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত' এই দুই উপন্যাসের ভিতর দিয়া লেখক আমাদের পূর্বতন অপরিবর্তনীয়, ক্ষমাহীন সংস্কারের পরিবর্তে সতীত্বের এক নূতন আদর্শ, যৌন পাপপুণ্য-বিচারের এক নূতন মানদণ্ড প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছেন।

গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল চরিত্র কিরণময়ীর। তাহার আচরণের অদ্ভুত বৈচিত্র্য ও অসঙ্গতি এক চরিত্রবৃন্তে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় কি না সে বিষয়ে মতভেদের অবসর আছে। লেখকের পরিকল্পনা

কিন্তু সুস্পষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত। হারাণের সহিত বিবাহে তাহার মননশক্তি অনুশীলিত হইয়াছে, কিন্তু হৃদয়াবেগের বুভুক্ষা মেটে নাই। মৃত্যুশয্যাশায়ী স্বামীর চোখের উপরে অনঙ্গ ডাক্তারের সহিত প্রেমাভিনয় এই অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণার পরিমাপক। ইহাকে কিরণময়ী নিজে অতিতৃষ্ণার্তের নর্দমার জল পানের সহিত তুলনা করিয়াছে। উপেনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, তাহার প্রভাবে অদ্ভুত চিত্তশুদ্ধি ও আন্তরিকতাপূর্ণ স্বামীসেবা, উপেনের প্রতি অকুণ্ঠিত মহিমাময় প্রেমনিবেদন, দিবাকরের প্রতি স্নেহ ও ছলাকলায় মিশ্রিত বিভ্রান্তকারী আচরণ, উপেনের প্রতি অসংবরণীয় প্রতিহিংসার আক্রোশে দিবাকরের সহিত পলায়ন, আরকানে দিবাকরের উত্তেজিত লালসার সহিত বীভৎস, গ্লানিকর সংঘর্ষ ও উপেনের মৃত্যু সংবাদে তীব্র আঘাতজনিত মস্তিষ্কবিকার—ইহার উপর বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতা, মোহকর রূপ, ও মাধুর্যঢালা ব্যবহার—সকলে মিলিয়া এক অপরূপ ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়া আমাদের অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধিকে কতকটা মোহাচ্ছন্ন করে। তাহার শেষ পরিণতি অনেকটা আকস্মিক—ইহার জন্য পাঠকের মনকে যথেষ্ট প্রস্তুত করা হয় নাই।

সতীশ-সাবিত্রীর প্রেম-কাহিনীর মধ্যে নানা বাধা-সঙ্কোচের মধ্যে অনুপম মাধুর্য স্বীকারের কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। মেসের গ্লানিকর ইতর আবহাওয়ায় এরূপ অপরূপ প্রণয়ের উদ্ভব অবাস্তব বলিয়াই ঠেকে। সাবিত্রীর বিমুখতা সনাতন আদর্শের জয় ঘোষণা। উপেন-সুরবালার দাম্পত্য সম্পর্ক ইহার চরম উৎকর্ষের উদাহরণ। সতীশ ও সরোজিনীর প্রেম, ইহার কুটিল, বিকৃত রূপান্তরগুলির সহিত

তুলনায় সুন্দর ও স্বাভাবিক—ইহা যেন শ্বাসরোধকারী অস্বাস্থ্যকর বদ্ধবায়ুর তুলনায় মুক্ত ও নির্মল দক্ষিণাবাতাস। প্রেমের বিচিত্র প্রকারভেদ উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

কিন্তু উপন্যাসটির সর্বাপেক্ষা গৌরবময় পরিচয় প্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। এতদিন পর্যন্ত বাংলা কাব্য-উপন্যাসে আমরা এই রহস্যময় ভাবের একটা ভাসা-ভাসা সাধারণ পরিচয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম। বঙ্কিমের উপন্যাসে ইহার বিস্ফোরক শক্তির প্রতি কখনও কখনও ইঙ্গিত করা হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গল্পে ইহার ঊর্ধ্বলোকবিহার, ইহার মুহুর্মুহু পরিবর্তন ও সূক্ষ্ম, নিগূঢ় অতৃপ্তির দিকটা চমৎকার ভাবে, কবিসুলভ সৌন্দর্য ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত আলোচিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা প্রথম ইহার ক্ষিপ্র তেজোময় বিদ্যুতশক্তি, নানা ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া ইহার গোপন আবির্ভাব, ইহার বে-হিসাবী বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য, ইহার সূক্ষ্ম, অশরীরী স্পর্শের ধারণা করিতে পারিয়াছি। এতদিন পর্যন্ত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ন্যায় আমরা পিটুলি-গোলা জলকেই দুগ্ধ বলিয়া পান করিয়া আনন্দমগ্ন হইতাম। শরৎ-চন্দ্রের উপন্যাসেই সর্বপ্রথম প্রেমের বিষামৃতে-মেশা প্রকৃতি, ইহার আনন্দ-বেদনাপ্লুত অনুভূতি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের ভাষা ভাব ভঙ্গী, ইহার উত্তেজনা-অবসাদ, দীর্ঘ সুপ্তির পর ইহার অতর্কিত জাগরণ, কর্তব্যবুদ্ধির সহিত ইহার সংঘর্ষ, অভিমান-ঔদাসীন্য-আঘাতশীলতার ভিতর দিয়া ইহার অলক্ষিত অগ্রগতি, ইহার অসীম কৃচ্ছ্রসাধনা ও দুঃখবরণ—এক কথায় ইহার সমস্ত রূপটি অপরূপ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রেমিক-প্রেমিকার কথোপ-

কথনের মধ্যে সুলভ নাটকীয় উচ্ছ্বাস, কৃত্রিম আলংকারিক শব্দাড়ম্বর নাই—সহজ সরল অগ্নিগর্ভ ভাষার মধ্য দিয়া দুই সন্নিহিত জলভারনত মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎশিখাবাহিত ব্যগ্র স্পর্শাতুরতার ন্যায়, হৃদয়-বিনিময়ের আকুলতা, প্রেমের একাগ্র মিলনোৎসুক্য ব্যক্ত হইয়াছে।

'শ্রীকান্ত' একদিক দিয়া শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহাতে উপন্যাসের অবিচ্ছিন্ন ঐক্য ও সংকীর্ণ পরিধি নাই। ইহার বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে ঘটনাগত পারম্পর্য অপেক্ষা ভাবগত ঐক্যই বেশি। ইহাতে লেখকের সহানুভূতিস্নিগ্ধ, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল, মৌলিক জীবনসমালোচনা অব্যাহত পরিপূর্ণ অবসর পাইয়াছে। যে উদার ক্ষমাশীল মনোবৃত্তি, সমাজলাঞ্ছিত ভাগ্যবঞ্চিত নরনারীর প্রতি যে স্নেহশীতল বিশুদ্ধ করুণা তাঁহার সমস্ত উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, এখানে তাহার উৎসমুখের সন্ধান মিলে। গ্রন্থখানিকে আত্মজীবনচরিতমূলক বলিয়া মনে করা হয়; হয়ত প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযোজ্য না হইলেও অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা যে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন হইতে সংগৃহীত তাহা নিরাপদে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বইখানি লেখকের মানস প্রসার, জীবনের সহিত সুদূরপ্রসারী বহুমুখী পরিচয়ের সত্য নিদর্শন। সর্বশেষে নিষিদ্ধ প্রেমের এক অতি-বিস্তারিত, তথ্যপরিপূর্ণ, ভাবাবেগসমৃদ্ধ জীবনেতিহাস ইহাতে অবিকৃত সত্যনিষ্ঠা ও গভীর মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সহিত বিবৃত হইয়াছে। এই সমস্তই গ্রন্থটির অনন্যসাধারণ উৎকর্ষের কারণ।

শ্রীকান্তের বাল্যজীবনের দুইটি প্রভাব তাহার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছ উদারতার উৎস—ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদির সাহচর্য। ইন্দ্রনাথের

সহিত নৌকায় দুঃসাহসিক নিশীথ-অভিযান বর্ণনাকৌশলে ও বালকের দ্বিধাহীন বিশ্বাস ও উত্তেজিত কল্পনার বিস্ফুরণে অপূর্ব। আবার ইন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিতায় অন্নদাদিদির সহিত পরিচয় তাহাকে অসামাজিক ছন্নছাড়া জীবনের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দিয়াছে। তারপর কয়েক বৎসরের ব্যবধানে পিয়ারী বাইজির সহিত সাক্ষাৎ তাহার জীবনকে সাধারণ বাঙালীর গতানুগতিক, কঠোর নিয়মশৃঙ্খলিত ধারা হইতে বিচ্যুত করিয়া একেবারে সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালীতে প্রবাহিত করিয়াছে। তাহার সমস্ত পরবর্তী জীবন এই জটিল সম্পর্কের গ্রন্থি-মোচনে, এই ক্ষুব্ধ ঘূর্ণিপাকের চক্রাবর্তকে অগ্রগতির সরল রেখায় গাঁথিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মীর সহিত শ্রীকান্তের প্রণয়লীলার বিভিন্ন সুরগুলি অদ্ভুত সূক্ষ্মদর্শিতা ও গাঢ় অথচ সংযত হৃদয়াবেগের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম দুই খণ্ডে বাধা আসিয়াছে শ্রীকান্তের আত্মসম্মানজ্ঞান ও সামাজিক নীতিবোধের দিক হইতে। রাজলক্ষ্মীর মিলনোৎসুক, অজস্র-উৎসারিত প্রেমনির্ঝর শ্রীকান্তের প্রতিদানহীন নিঃস্পৃহতার শীতল স্পর্শে জমিয়া পাথর হইয়াছে। কখনও বা আসন্নবর্ষণ মেঘের ন্যায় থমথমে গাম্ভীর্য-বিষাদের মধ্যে, কখনও বা অশ্রুজলাভিষিক্ত বেদনার মধ্যে তাহাদের বিদায়ের পালা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্মা-প্রবাসের দীর্ঘ মেয়াদে শ্রীকান্ত আরও বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসিয়াছে ও ইহার ফলে তাহার মনের বন্ধন-মুক্তি ও প্রসার আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই নূতন আবেষ্টনে, মানবপ্রকৃতির অভিনব বিকাশ ও প্রবণতার সহিত পরিচয়ে সে আমাদের সামাজিক রীতি-

নীতির মূঢ় অবিবেচনা ও নিষ্ঠুর, আত্মঘাতী পীড়নের বিষয় আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। এই সময়ে অভয়ার দৃপ্ত স্বাধীনতা ঘোষণা, তাহার স্বামীত্যাগের অসংকোচ মর্মসাহসিকতা শ্রীকান্তের এই বন্ধন-মুক্তি সাধনার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়াছে।

এবার শ্রীকান্তের আগ্রহের পালা। অভয়ার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া সে এবার রাজলক্ষ্মীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে মনঃস্থির করিয়া বর্মা হইতে ফিরিয়াছে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর সপত্নীপুত্রের উপস্থিতিতে মাতৃত্ববোধের স্ফুরণ ও ধর্মের নেশা তাহার প্রণয়াবেগকে অনেকটা মন্দীভূত করিয়াছে। তাহার শ্রীকান্তের সহিত মিলনের কুণ্ঠিত ইচ্ছাপ্রকাশ আবার শ্রীকান্তের সম্ভ্রমজ্ঞানের দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়াছে। শেষে স্বগ্রামে তাহার রোগশয্যাপার্শ্বে আমন্ত্রিতা রাজলক্ষ্মীকে সে প্রকাশ্যভাবে আত্মীয়মণ্ডলীর সম্মুখে সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে রাজলক্ষ্মীর ধর্মলোলুপতা ও আচারনিষ্ঠা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠিয়া তাহাদের মিলনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। গঙ্গামাটিতে তাহাদের একত্র অবস্থানের দিনগুলির উপর নিঃসঙ্গতার দুর্বিষহ বেদনা, নির্লিপ্ততার ধূসর ক্লান্তি নিবিড়ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী ধর্মের খেলায় মাতিয়া কৃচ্ছ্রসাধনের স্বার্থপরতায় শ্রীকান্ত হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে ও শ্রীকান্ত নীরব অনুযোগহীন ক্ষুণ্ণতার সহিত রাজলক্ষ্মীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এইখানেই উপন্যাসের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি। এই খণ্ডে শরৎচন্দ্রের চিন্তাশীলতা বাড়িয়া যেন দৃষ্টিশক্তির সতেজ দীপ্তিকে অনেকটা ম্লান করিয়াছে।

চতুর্থ খণ্ডে নূতন বন্ধুপ্রীতি ও প্রণয়াকর্ষণের অবতারণা দ্বারা গ্রন্থের জীবনপরিধি কৃত্রিমভাবে বাড়ানো হইয়াছে। তাহার বাল্যবন্ধু গহরের সহিত এক সাহিত্যিক রুচিসাম্য ছাড়া শ্রীকান্তের আর কোনো অন্তরঙ্গ মিল নাই। কমললতার সহিত প্রেমাভিনয়ের ব্যাপারটাও আকস্মিকতা ও আতিশয্য দুষ্ট। যে উদ্ভব ও ক্রমপরিণতির ইতিহাস রাজলক্ষ্মীর প্রেমকে সুদৃঢ় বাস্তবতা ও সতেজ জীবনীশক্তি দিয়াছে, কমললতার ক্ষেত্রে তাহার একান্ত অভাব। এখানে প্রণয়নিবেদনের অতিপল্লবিত বাহুল্য আগাছার অতর্কিত ও অস্বাস্থ্যকর অতিবিস্তারের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই প্রৌঢ় বন্ধুত্ব ও প্রৌঢ় প্রেমের উপর পাণ্ডুর রক্তাল্পতার চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট। শেষ পর্যন্ত কমললতার গ্রাস হইতে শ্রীকান্তকে উদ্ধার করিবার জন্য যে রাজলক্ষ্মীকে অশোভন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইতে হইয়াছে, ইহা তাহার ও তাহার প্রেমের চূড়ান্ত অপমান। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে লেখকের কল্পনাশক্তির ক্রমবর্ধমান অবসাদ, একই সুরের ক্লান্ত পুনরাবৃত্তিপ্রবণতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের শেষ সম্পূর্ণ উপন্যাস 'শেষ প্রশ্নে' তত্ত্বপ্রিয়তা রসানুভূতিকে অভিভূত করিয়াছে। রাজলক্ষ্মী-অভয়া-সাবিত্রীর ক্ষেত্রে যে বিদ্রোহ ও ব্যাকুল অস্বস্তিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তাহাদের জীবনের মর্মস্থল হইতে উৎসারিত হইয়াছে, নানা বাধা-সংকোচের চারিদিকে আবর্তিত হইয়া রসনিবিড়তা লাভ করিয়াছে, কমলের মুখে তাহা হৃদয়সম্পর্করহিত, জোরালো তর্কের আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এমন কি কিরণময়ীর বিদ্রোহ অনুভূতি ও মর্মবেদনার যে গভীর স্তর হইতে

উদ্ভূত হইয়াছে, কমলের বিদ্রোহাত্মক উক্তিগুলিতে সেরূপ গভীরতার কোনো আমেজ নাই—ইহা কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য মতবাদের অকুণ্ঠিত প্রকাশ মাত্র। সে জীবনের সমস্ত জটিল ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার মনের ফলকে নূতন দাগ কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার মধ্যে নূতন-পুরাতনে কোনো দ্বন্দ্ব নাই বলিয়া তাহার আচরণ আমাদের বুদ্ধির স্তর অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের স্তর পর্যন্ত পৌঁছায় নাই।

উপন্যাস-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দান সম্বন্ধে পূর্বেই লেখা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনাভঙ্গীর অননুকরণীয়তা ও কাব্যগুণসমৃদ্ধির জন্য উপন্যাসের সাধারণ বিবর্তনধারার বহির্ভূত। সেই বিবর্তনধারা শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ও তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া নূতন বাঁক লইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেমন, তেমনি শরৎচন্দ্রের উপন্যাস এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তক—স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কবি ও ঔপন্যাসিকের পক্ষে ইহাদের প্রভাব দুরতিক্রম্য। ভবিষ্যৎ উপন্যাসের গতি ও উদ্দেশ্য প্রধানতঃ শরৎচন্দ্রের দৃষ্টান্ত ও নির্দেশের অনুসরণ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

অতি-আধুনিক উপন্যাসের ধারা

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা উপন্যাস সমুদ্র-প্রবেশোন্মুখ নদীর ন্যায় গতিপথের ঐক্য হারাইয়া অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতীতযুগের অনুশীলনের ফলে বিষয়-নির্বাচন, আলোচনাপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা তাহাকে পূর্ণভাবে স্বীকার না করিয়া তাহার মধ্যে নানা বৈচিত্র্য প্রবর্তন করিতেছেন। অবশ্য এই মৌলিকতার বীজ পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে উপ্ত হইয়াছিল—আধুনিকেরা ইহাকে পূর্বতন প্রতিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ও ইহার উপাদানসমূহের মধ্যে ভাব ও পরিমাণগত তারতম্য ঘটাইয়া ইহাকে এক অপ্রত্যাশিত নূতন রূপ দিয়াছেন। নিষিদ্ধ ও সমাজ বিগর্হিত প্রেমের সমবেদনাস্নিগ্ধ ও মনস্তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত পূর্বযুগের উপন্যাসেই হইয়াছে। তবে এই উপন্যাসে অসামাজিক হৃদয়াবেগের অসাধারণত্বের একপ্রকার কথিত বা অকথিত পূর্বস্বীকৃতি আছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাঙালী-সমাজে অবাঞ্ছিত প্রেমের বিরলত্ব সম্বন্ধে সচেতন আছেন বলিয়াই ইহার আবির্ভাবের পটভূমিকা রচনার দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন—ইহাকে হয় আদর্শলোকের উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্র করিয়াছেন না হয় যে বিপুল, অসংবরণীয় উচ্ছ্বাস ও প্রতিবেশ-বৈশিষ্ট্য হইতে ইহার

উদ্ভব তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্বারা ইহাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়াছেন; ইঁহারা অবৈধ প্রেমের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার পিছনে আছে উচ্চতর নীতিবোধের সমর্থন, বিদ্রোহের বীজ, বঞ্চিতের প্রতি ন্যায়-বিচারমূলক সহানুভূতি ও হৃদয়াবেগের অনুপম রসমাধুর্য।

অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব লইয়া এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রথমত, ইহারা এইরূপ অবৈধ প্রেমের উদ্ভবকে বাঙালী সমাজের একটি অতিসুলভ স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাবরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার সম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা কেমন করিয়া প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যে জন্মিল, কি বিপুল হৃদয়াবেগের দোলায় আন্দোলিত হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিল তাহার কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ইহাদের উপন্যাসে মিলে না। অতি-আধুনিক লেখকগোষ্ঠী এই অবাধ যৌন আকর্ষণকে প্রতিবেশ-প্রভাবের মাধ্যাকর্ষণ-মুক্ত করিয়া ইহাকে একটা স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা দিয়াছেন; ইহা তাঁহাদের কোনো বিস্ময় উদ্রেক করে না; জীবনের সদাপ্রত্যক্ষ, অতিপরিচিত সত্যের মত ইহা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কোনো ভূমিকা না করিয়াই তাঁহাদের উপন্যাস-জগতের অধিবাসী হইয়াছে।

আলোচনার দিক দিয়াও ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব সহজেই লক্ষণীয়। অবিমিশ্র বাস্তববাদই ইহাদের প্রধান ধর্ম ও ইহাদের অনুসৃত প্রণালীর চূড়ান্ত সমর্থন এইরূপ দাবি ইহাদের তরফে করা হয়। কিন্তু আলোচনার মধ্যে যে সব সময় নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবানুসরণের পরিচয় মিলে তাহা মনে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে অবৈধ

প্রেমের তিক্ত বীভৎস গ্লানিকর দিকটার ও ইহার কদর্য প্রতিবেশের উপরই অত্যধিক জোর দেওয়া হয়—যেন পঙ্কস্তরের পূতিগন্ধবিশ্লেষণই পঙ্কজের একমাত্র সত্য পরিচয়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ঔপন্যাসিকের প্রথম বয়সের রচনা পড়িলে মনে হয় যে নিছক কুৎসিত-প্রীতিই তাঁহাদের বিষয়নির্বাচনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার ইহাদেরই পরবর্তী রচনায় বাস্তবানুগত্য অন্য দিক দিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—কর্দমের হোলিখেলার পরিবর্তে কাব্যপ্লাবনের জোয়ার আসিয়া বাস্তবতার ভিত্তিমূল পর্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে ও অতীন্দ্রিয় রহস্যের আভাস পারিজাতকুসুমসুরভির ন্যায় বাস্তব পরিবেশকে পরিব্যাপ্ত ও আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহাদের কয়েকটি উপন্যাসের নামকরণের মধ্য দিয়াই এই রীতি ও আদর্শ পরিবর্তন ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

২

কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের রচনায় নরনারীর যৌন-আকর্ষণ এক নূতন রকমের উদ্ভট কল্পনাবিলাসের প্রেরণা দিয়াছে। কেহ বা ইহার আদিম প্রকৃতি ও বাস্তব অবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ইহাকে এক নিরুত্তাপ, দেহলালসাহীন, স্নিগ্ধ সখ্যবন্ধনের রূপ দিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ যে বন্ধুত্বের নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে এই সম্ভাবনা অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত নহে। মানব-প্রকৃতির মূল উপাদান লইয়া ইহা যেন রাসায়নিক পরীক্ষাগারে এক নূতন, কৌতূহলোদ্দীপক পরীক্ষা।

কোথায়ও বা যৌন-আকাঙ্ক্ষাকে জীবনের কেন্দ্রস্থ শক্তিরূপে

স্বীকার করিয়া ঔপন্যাসিক ইহার অবাধ স্ফুরণের অনুকূল এক উদ্ভট কাল্পনিকতাময় প্রতিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। রূপক-বিলাসের সহিত পাশবিক নির্মমতার ভয়াবহ ইঙ্গিত, অসুস্থ মনোবিকার ও নগ্ন বীভৎসতা, যাযাবরত্বের মোহ ও অজ্ঞাতের আকর্ষণ, গৃহিণীত্ব ও মাতৃত্বের প্রভাবে যৌনলালসার অবদমন ও রূপান্তর, সমাজ ও ধর্মবোধের নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া ইহার চরম আত্মবিলাস—এইরূপ নানা বিচিত্র প্রকাশের ভিতর দিয়া কোনো কোনো লেখক যৌন-সমস্যার প্রকৃতি রহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হইয়াছেন।

আবার কাহারও উপন্যাসে প্রেমের মুগ্ধ ভাববিহ্বলতা ও আদর্শ-প্রবণতা বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণরূপে উবিয়া গিয়াছে ও ইহার উপহাস্য অশ্রদ্ধেয় দিকটাই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রেমের দুর্বলতা, আদর্শচ্যুতি ও অসুস্থ বিকৃতি—ইহার ক্ষণিক উচ্ছ্বাস, মত্ত অসংযম, নির্মম আত্মপীড়ন, ধূসর ক্লান্তি ও উদ্‌ভ্রান্ত আত্মকেন্দ্রিকতা—ব্যঙ্গপ্রধান মনোভাব ও সূক্ষ্ম পরিমিতিবোধের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। স্বর্গো-দ্যানের ফলের মধ্যে কটুতিক্ত আস্বাদ মাধুর্যরসকে অভিভূত করিয়াছে। যেমন অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে স্নিগ্ধ জ্যোতির্মণ্ডিত চন্দ্রমণ্ডলে আজ বন্ধুর শ্যামলতাহীন পর্বতশৃঙ্গ ও গহ্বরের কলঙ্কচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেইরূপ বাস্তবতাপ্রধান মনোবৃত্তি প্রেমকে আদর্শ-লোকের স্বর্গরাজ্যচ্যুত করিয়া ইহাকে ধরণীর ধূলিতে লুণ্ঠিত ও ইহার মধ্যে মানবাত্মার অগৌরব ও লাঞ্ছনার পুঞ্জীভূত লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

৩

অতি-আধুনিক জীবনের সমস্যাপ্রধানতা যেমন পাশ্চাত্য,

সেইরূপ বাংলা সাহিত্যকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রতিবেশের সহিত জীবনের ক্রমবর্ধমান অসামঞ্জস্য অর্থনীতি ও সমাজনীতি হইতে কাব্য-উপন্যাসে সংক্রামিত হইয়াছে। যে বায়ুমণ্ডলের চাপ এতদিন অননুভূতরূপে আমাদের সহজ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের সহায়তা করিত, তাহা আজ নানা বিরুদ্ধ উপাদানের সংমিশ্রণে, কলকারখানার ধূলা ও ধূমে ভারি হইয়া, প্রায় শ্বাসরোধকারী হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই আজ আমাদের মানবিক পরিচয়কে আচ্ছন্ন করিয়া এই আবেষ্টনের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রশ্নই প্রবলতর হইয়াছে। যখন সমাজ-প্রতিবেশের সঙ্গে আমাদের সহজ আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল, তখন হৃদয়বৃত্তিসমূহ, কেবল পারস্পরিক প্রভাবের ফলে, পূর্ণ পরিণতির সুযোগ পাইত। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই প্রতিবেশ-নিরপেক্ষ, ব্যক্তিগত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে দোলায়িত হৃদয়বৃত্তির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে হৃদয়াবেগের স্বাধীনতার বিদ্রোহ ঘোষিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এখানেও প্রতিকূল সমাজশক্তি অনতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করে নাই। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও কিয়ৎপরিমাণে দুঃখ বরণের মূল্য দিয়া বিদ্রোহী প্রেম নিজ স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখানে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহা মূলতঃ হৃদয়াবেগের স্পর্ধা ও শক্তির পরিমাণ লইয়া; ইহা ভিতরের সংকোচ ও বাহিরের বাধা কাটাইয়া উঠিবার মত উত্তাপ ও দৃঢ় সংকল্প অর্জন করিয়াছে কি না, উপন্যাসের সমস্যা তাহারই বিচার ও আলোচনা।

কিন্তু যুদ্ধোত্তর জগতে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা আজ সর্বগ্রাসী অভিভবে জীবনকে বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ কেবল যে আমাদের ব্যবহারিক-প্রয়োজনগত জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা নয়, আমাদের সুকুমার ভাবজীবনের মর্মস্থলে পর্যন্ত ইহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অত্যল্পকাল ব্যবধানে পর পর সংঘটিত দুইটি মহাযুদ্ধ রাষ্ট্রশক্তির এই সর্বনাশা প্রভাব সম্বন্ধে মানুষকে উগ্রভাবে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। আজ সে বুঝিয়াছে যে ধনিকসংঘের স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত ষড়যন্ত্র রাষ্ট্র-শক্তির পিছনে অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল; এবং এই ক্রুর অশুভ শক্তিই জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বাধাইয়া আমাদের সমাজ, পরিবার ও নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনকে বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আজ আমাদের দয়া, মায়া, প্রেম প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়বৃত্তিগুলির সুস্থ বিকাশ ও পরিণতি ধ্বংসের বীজাণুপূর্ণ দুষ্ট আকাশ-বাতাসে ব্যাহত হইতেছে। প্রেমের সুস্থ স্বচ্ছন্দ বিকাশের জন্য, মানবিকতার পূর্ণ চরিতার্থতার জন্য যে শান্ত স্নিগ্ধ ন্যায়নিষ্ঠ পরিবেশের প্রয়োজন, বর্তমান ধনতন্ত্র-শাসিত, শক্তির মোহে উদ্‌ভ্রান্ত জগতে তাহার একান্ত অভাব। অস্বাভাবিক পরিবেশের এই পাষাণভার দুঃস্বপ্নের ন্যায় মানুষের সমগ্র অনুভূতিকে অভিভূত করিয়াছে—তাহার রক্তসঞ্চালন, তাহার হৃৎস্পন্দনের ছন্দ পর্যন্ত ইহারই চাপে উৎক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত। আজ তাহার ইহলোকের সুখ ও পরলোকের আশা, তাহার গভীরতম রসানুভূতি ও ঊর্ধ্বতম অভীপ্সা, সমস্তই এক দুশ্ছেদ্য বন্ধনে শৃঙ্খলিত—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে যেন আর একটা রসাতলমুখী টান যুক্ত

হইয়া তাহার অগ্রগতিকে এক অসম্ভব কৃচ্ছ্রসাধনে পরিণত করিয়াছে। আমাদের কাব্য-সাহিত্য-দর্শন, আমাদের বিশুদ্ধতম সৌন্দর্যপিপাসা ও কাম্যতম আনন্দ, আমাদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষার মাদক সুধা ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের তৃপ্তি—কিছুই এই সর্বচৈতন্যলীন ব্যর্থতার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। আগ্নেয়গিরির পাদদেশে বাসগৃহ নির্মাণের মতো আমাদের সমস্ত আত্মোন্নতির প্রচেষ্টা ও রূপসৃষ্টির প্রয়াস একটা আসন্ন প্রলয়ের স্তব্ধ প্রতীক্ষায় অর্ধ-অসমাপ্তির বিশৃঙ্খলাস্তূপের মধ্যে অসহায়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

এই অবস্থা-সংকটের মধ্যে সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও আলোচনা পদ্ধতিও এক নূতন আঙ্গিকের আশ্রয় লইয়াছে। অমীমাংসিত সমস্যার সমস্ত চিত্তবিক্ষেপ ও দ্বিধাদুর্বল, খণ্ডিত প্রকাশভঙ্গী আধুনিক সাহিত্যে প্রতিফলিত। আধুনিক ঔপন্যাসিক জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অন্তর্জীর্ণতার জন্যই কোনো সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসরণে অক্ষম। হৃদয়াবেগের মধ্যে যাহা তীক্ষ্ণতম অনুভূতি সেই প্রেমও আজ নানা জটিল সমস্যাজালে সমাচ্ছন্ন; এই অসংখ্য প্রশ্নমথিত প্রেম তাহার স্বাভাবিক স্রোতোবেগ ও স্বচ্ছ প্রবাহ হারাইয়া শৈবালাচ্ছন্ন নদীর ন্যায় আঁকিয়া-বাঁকিয়া অতি ক্ষীণগতিতে বহিয়া গিয়াছে। ইহার বক্ষে চিরন্তন অতৃপ্তি ও ধূসর মোহভঙ্গ বাসা বাঁধিয়াছে; সামাজিক, নৈতিক ও মিলনোন্মুখ দুইটি প্রাণের অহরহ পরিবর্তনশীল, অনির্দেশ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রয়োজন-অধিকার-ঘটিত প্রশ্নজাল ইহার চারিদিকে এক দুর্ভেদ্য, দৃষ্টিবিভ্রমকারী বাষ্পযবনিকা রচনা করিয়াছে। ঔপন্যাসিক একদিকে এই সূক্ষ্মতন্তুজালরচিত যবনিকা

বয়ন করিতে ও অপরদিকে এই যবনিকার অন্তরালবর্তী প্রেমের অস্ফুট-অবগুণ্ঠিত আভাস ফুটাইয়া তুলিতে সমানভাবে ব্যস্ত। সবসুদ্ধ মিলিয়া, পটভূমিকারচনায় বিপুল প্রয়াস ও আয়োজন ও ইহার মধ্যে মানবিক পরিচয়ের ঈষৎ—বিচ্ছুরিত, অস্পষ্ট অভিব্যক্তি রচনাকে ঘোরালো ও পাঠককে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া তোলে।

আধুনিক ঔপন্যাসিকগোষ্ঠীর মধ্যে কাহারও কাহারও রচনায় প্রেমের এই সমস্যাসংকুলতা বিশেষ ভাবে উদাহৃত হইয়াছে। কোথায়ও তত্ত্বালোচনার সহিত সৌন্দর্যানুভূতির সুষ্ঠু সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে; কোথায়ও বা মননশীলতা প্রেমের ভাবোপলব্ধিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই জাতীয় উপন্যাসে প্রেমের যে সমস্যা আলোচিত হইয়াছে, তাহা ঠিক প্রেমের প্রকৃতিগত নহে আধুনিক যুগের জটিল ও কেন্দ্রভ্রষ্ট বহির্জগতের বিশৃঙ্খলা হইতে উদ্ভূত। মতবাদ কর্তৃক অধিকৃত চিত্তের রন্ধ্রপথে প্রেমের মন্থর ও বিসর্পিত সঞ্চরণই এই উপন্যাসের উপজীব্য। বিরুদ্ধ মতবাদ ও চিন্তাধারার ভিড় ঠেলিয়া এই প্রেম কোনোমতে পথ করিয়াছে; যুক্তিতর্কের উদ্দাম ঝড়ে ইহার অন্তরের সৌরভ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও ইহার অঙ্গ ধূলিধূসরিত হইয়াছে। তথাপি যেন মনে হয় এই অভিনব পরীক্ষায় ইহা নূতন জীবনীশক্তি অর্জন করিয়াছে; ইহার স্পর্শঅসহিষ্ণু কোমল ভাববিহ্বলতা নানা অভিজ্ঞতার সংঘাতে, নানা মতবাদের আন্দোলনে, তীক্ষ্ণ মননশীলতার সহিত একাত্মসংযোগে ব্যায়ামপুষ্ট দেহের ন্যায় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ পরিণতি লাভ করিয়াছে। আধুনিক যুগের প্রেম প্রাচীন স্বাধীনতা ও সংকোচের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া এক দুর্গম বিঘ্নবহুল পথের অভিযাত্রী

হইয়াছে ; জনতাসংঘের কোলাহলের হাটে, প্রাণশক্তির বহুধা-বিভক্ত কর্মব্যস্ততার যন্ত্রশালায়, জীবনের চরম সার্থকতা নিরূপণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে, আজ প্রেমের প্রকৃতি ও গতিচ্ছন্দ নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হইতেছে।

অতি-আধুনিক উপন্যাস নানা পরীক্ষামূলক নূতন পরিকল্পনার পথ অনুসরণ করিলেও, প্রাচীন ধারার সহিত সম্পর্ক একেবারে বর্জন করে নাই। নূতন রীতি প্রবর্তনের সহিত পুরাতন ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষার সামঞ্জস্যবিধান প্রয়াস কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের রচনায় পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাদের বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গীর যে অভিনবত্ব আছে, তাহা পুরাতনের অস্বীকৃতিমূলক নহে। ইহাদের রচনায় প্রেম বা যৌনলালসার অতিপ্রাধান্য নাই ; আধুনিক যুগের দ্রুতপরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সমগ্র চিত্র আঁকিবার চেষ্টা আছে। কেহ বা পল্লীজীবনের অতি সাধারণ আবেষ্টনে ছেলেখেলার ভিতর দিয়া প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে কি করিয়া শিশু-কল্পনার উন্মেষ হয়, কেমন করিয়া রহস্যময় অনুভূতির নিবিড় তন্ময়তা চিত্তের সরলতা ও কল্পনার সৌকুমার্যকে রূঢ় সাংসারিকতার প্রভাব হইতে রক্ষা করে তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্র হইতে দূরে, প্রদেশের প্রত্যন্তসীমায় অবস্থিত পল্লীসমাজের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যুগপ্রভাবে কিরূপে ভাঙন ধরিয়াছে তাহারই তথ্য-সমৃদ্ধ ও বেদনাক্ষুব্ধ ইতিহাস তাঁহাদের উপন্যাসের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত সুদূর গ্রামাঞ্চলে যে মধ্যযুগোচিত মনোভাব

ও সংস্কার আধুনিক যুগ পর্যন্ত টিঁকিয়া ছিল, যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও অধিকারনির্দেশ সমাজের বিভিন্ন স্তরকে এক সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করিয়াছিল, যাহা রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তনের মধ্যেও সমাজ-নীতির আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, প্রথম মহাযুদ্ধের বিপর্যয়ের অভিঘাতে সেই সুপ্রাচীন, যুগযুগান্তরস্থায়ী সংস্কৃতির ও শৃঙ্খলার ক্রমিক শিথিলতা ও বিলোপের কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। এখানে নায়কনায়িকা অপেক্ষা সাধারণ প্রতিবেশেরই প্রাধান্য; চরিত্রসৃষ্টি অপেক্ষা সমগ্র সমাজ-জীবনের চিত্রাঙ্কনই লেখকের মুখ্যতর উদ্দেশ্য। এই জাতীয় উপন্যাসে সনাতন প্রথার উন্মূলনে চিরাচরিত রীতির বিপর্যয়ে মনে যে বিহ্বল, বিস্মিত-বেদনা জাগে তাহাই প্রধান অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে একদিকে গীতিকাব্যের গভীর অনুভূতি ও অন্যদিকে পটভূমিকার বিশালত্বের জন্য মহাকাব্যোচিত ব্যাপ্তি ও প্রসার লক্ষিত হয়।

আধুনিক উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য প্রবর্তনের নানাবিধ প্রয়াস দেখা যায়। মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর জীবনযাত্রা কৃত্রিম আচার-অনুশাসনের দ্বারা এত কঠোরভাবে নিয়মিত যে ইহার মধ্যে স্বাধীন চিত্তবৃত্তি স্ফুরণের অবকাশ অপেক্ষাকৃত অল্প। কাজেই যে উপন্যাস ইহাদের জীবনকাহিনী পর্যালোচনায় সীমাবদ্ধ তাহাতে একই রূপ বিষয় ও ভাবধারার পুনরাবৃত্তি অনেকটা অপরিহার্য। সেই জন্য একজাতীয় উপন্যাসে নিম্নশ্রেণীর ও বিভিন্ন সংস্কারাবলম্বী স্ত্রীপুরুষের অপেক্ষাকৃত মুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের কথা আলোচিত হইয়াছে। কয়লাখাদের কুলিমজুর, কলকারখানার শ্রমিক ও সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম

অনার্য জাতির মধ্যে যেরূপ জীবনযাত্রা প্রচলিত, তাহার মধ্যে অভিনবত্বের পর্যাপ্ত উপাদান আছে। কুলিমজুর জাতীয় লোক গ্রাম্য সমাজের স্নিগ্ধ হিতকর প্রতিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন এক কৃত্রিম প্রয়োজন-রচিত আশ্রয়স্থলে বাস করে বলিয়া ইহাদের মধ্যে নীতির অনুশাসন ও চিরন্তন হৃদয়সম্বন্ধগুলিও অনেকটা শিথিল হইয়া পড়ে; ইহাদের আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাস কোনো সংযমের অধীন না হইয়া অকুণ্ঠিত তীব্রতার সহিত আত্মপ্রকাশ করে। ইহাদের কর্মজীবনের অস্থায়িত্ব ও স্থূল স্বার্থবাদ ইহাদের সূক্ষ্ম ও সুকুমার বৃত্তিগুলিকে অনেকটা অসাড় ও ইহাদের খেয়ালপ্রবণতাকে উগ্রতর করিয়া তোলে। সেইজন্য উপন্যাসে আলোচিত হইবার পক্ষে ইহাদের বিশেষ যোগ্যতা ও আকর্ষণী শক্তি আছে। সাঁওতালদের সংস্কার ও রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য ও উচ্চবর্ণের হিন্দু গৃহস্থের সহিত মেলামেশায় তাহারা যে সন্দেহপ্রবণ রক্ষণশীলতার পরিচয় দেয় তাহার অভিনবত্ব উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু মোটের উপর উপন্যাসে এই শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রা বর্ণনা কতকটা অভিনবত্ব প্রবর্তনের হেতু হইলেও খুব উচ্চ অঙ্গের কলাকৌশলসমন্বিত হয় নাই। ইহাদের আচারব্যবহারের বাহ্যবৈচিত্র্যটুকু বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আশানুরূপ গভীর হয় নাই; ইহাদের জীবনের ছন্দরহস্যটির মূলসূত্র ঔপন্যাসিক আলোচনায় ধরা পড়ে নাই।

৫

অতি-আধুনিক উপন্যাসে হাস্যরসিকতার একান্ত অভাব।

একদিকে জটিল, সমস্যাসংকুল প্রতিবেশ, অভাব-অনটন-অসন্তোষ-ক্ষুব্ধ জীবনযাত্রা; অপরদিকে ঔপন্যাসিকদের ভাববিহ্বলতা, শ্লেষপ্রবণতা ও যৌনকামনা বিশ্লেষণের প্রতি অতি-আগ্রহ উপন্যাসে হাস্যরস-স্ফুরণের বিশেষ কোনো অবসর রাখে নাই। জীবনের প্রতি যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনযুদ্ধের মারামারি-হানাহানির উৎকট অসংগতি হইতে মোহমুক্ত আত্মসংবরণের যে অভ্যাস হাস্যরসের মূল উৎস, উদ্দেশ্যধর্মী ও নূতন আবিষ্কারের প্রতি একাগ্রদৃষ্টি উপন্যাসে তাহা মোটেই সুলভ নহে। জীবনের ব্যর্থতার জন্য বেদনাবোধ যথেষ্টই আছে; কিন্তু ইহা নির্মল, কারুণ্যস্নিগ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি না করিয়া চিত্তকে ব্যঙ্গপ্রবণতার তিক্ততায় ও বিদ্রোহের ধূমকলুষিত উত্তাপে ভরিয়া তোলে। দুই একজন হাস্যরসিক ঔপন্যাসিক সমসাময়িক উপন্যাসের এই সাধারণ ধর্মের উপভোগ্য ব্যতিক্রম। শিশুচিত্তের উদ্ভট খেয়াল ও বাস্তববন্ধন-অসহিষ্ণু কল্পনা এই হাস্যরস সৃষ্টির একটা প্রধান উপাদান। তা ছাড়া আধুনিক সমাজে মতবাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আদর্শনিষ্ঠার আতিশয্য, রুচিবিকার ও নূতন নূতন আমোদ-প্রকরণের অপরিমিত আকর্ষণ নানারূপ অসংগতি ও অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়া হাস্যরসের উদ্রেক করিতেছে। কোনো এক দিকে বেশি চাপ পড়িলেই সমাজ-জীবনের ভারসাম্য বিচলিত হয়; এবং এই উৎকেন্দ্রিকতার সহিত কৌতুকবোধের সংযোগ হইলেই হাসির শুভ্রচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়। আকাশসঞ্চিত বাষ্পের সঙ্গে শীতল বায়ুপ্রবাহের সম্মিলনে যেমন বৃষ্টি নামে, তেমনি সমাজে পুঞ্জীভূত বৈষম্য-অসংগতি যখন ক্রোধ বা তিক্ততার পরিবর্তে রসিকের

সমবেদনাস্নিগ্ধ চিরন্তন পরিমিতিবোধকে আবাহন করে, তখনই হাসির উদ্ভব। সুতরাং দুঃখবাদবিক্ষুব্ধ, ব্যর্থতাবোধক্লিষ্ট আধুনিক সমাজেও হাস্যরসের উৎস আবিষ্কৃত হইতে পারে, যদি লেখকের মধ্যে আবিষ্কারের উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী থাকে।

৬

বর্তমান যুগে ছোটগল্পের প্রসার আশ্চর্যরূপ বাড়িয়াছে। বড় উপন্যাস রচনার উপযুক্ত মানস সংহতি ও স্থৈর্য বর্তমান চিত্তবিক্ষেপের যুগে মোটেই সুলভ নহে; কিন্তু ছোটগল্পের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা ও অনবদ্য রূপায়নের উপর অনেক আধুনিক লেখক অসাধারণ অধিকার দেখাইয়াছেন। ইহারা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরিধি অতিক্রম করিয়া আরও বিচিত্র, সূক্ষ্মরেখাঙ্কিত, ভাব-গহন শিল্পসৃষ্টির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। কোনো কোনো তরুণ লেখকের ছোটগল্পে বিষয়-নির্বাচনের অভিনবত্ব ও আলোচনা ও রূপায়নের তীক্ষ্ণ বৈশিষ্ট্য এই জাতীয় রচনার পরিণতির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। জীবনের প্রত্যন্তদেশস্থিত নানা খণ্ডাংশের মধ্যে ইহার চিরন্তন, অথচ অচিন্তিতপূর্ব বিস্ময়ের আবিষ্কার, ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষার সার্থক প্রয়োগে রসঘন ও অর্থগূঢ় ভাবমণ্ডল রচনা, নূতন সমস্যার অভিঘাতে মানব-প্রকৃতি রহস্যের নব নব উদ্‌ঘাটন—এই সমস্ত গুণই আধুনিক ছোট গল্পের উৎকর্ষের ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার নির্দেশক। এইরূপে আধুনিক যুগের গল্পসাহিত্য অতীত মনীষীদের প্রভাব অতিক্রম করিয়া নূতন পরীক্ষার অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়া, নূতন শক্তি ও সৌন্দর্যের অনুসন্ধানে, জীবনের পুঞ্জীভূত বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্য সমস্যাসংকুলতার

মধ্যে নব সুষমা আবিষ্কারের দুরূহ অধ্যবসায়ে অনুপ্রাণিত হইয়া অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। অশ্রান্ত কৌতূহল ও প্রগতিশীলতা যদি প্রাণশক্তির নিদর্শন হয়, তবে আধুনিক উপন্যাস যে বিশেষভাবে প্রাণরসসমৃদ্ধ তাহা অস্বীকার করা যায় না।